বীরবল সাহনি

জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা

বীরবল সাহনি

শক্তি এম. গুপ্তা

অনুবাদক

জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

1990 (শক 1912)

মূল্য : 10·50 টাকা

BIRBAL SAHNI (*Bengali*)

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীণ পার্ক, নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত।

কৃতজ্ঞতা

বীরবল সাহনি সম্পর্কে কিছু লেখা কঠিন। কেননা, দেখা গেছে জীবনে যাঁরা নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছেন বা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছু লেখা মোটেই সহজ কাজ নয়।

এই জীবনী লিখতে গিয়ে আমি ডঃ সাহনির বোন শ্রীমতী লক্ষবন্তী মালহোত্রার বাল্যজীবনের স্মৃতি থেকে অনেক কিছু নিয়েছি। অকালমৃত্যু যাঁর জীবনে ছেদ টেনে দিল এবং তারপর যিনি তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেই ডঃ সাহনির পত্নী শ্রীমতী সাবিত্রী সাহনির কাছ থেকেও অনেক কিছু জেনে নিয়েছি। শ্রীমতী সাহনির কাছে ডঃ সাহনির যে-সকল লেখা ছিল, তিনি অনুগ্রহ করে সেগুলি আমাকে দেখতে দিয়েছেন এবং এসকল কাগজপত্র সম্পর্কে আমার সংগে কথা বলার জন্য অনেকটা মূল্যবান সময়ও দিয়েছেন।

এই জীবনীর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে গিয়ে যাঁদের অমূল্য সাহায্য পেয়েছি, আমার সেই দুই ভাই ডঃ প্রহ্লাদদেব মালহোত্রা এবং লেঃ কর্ণেল অরবিন্দদেব মালহোত্রার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। লক্ষ্ণৌ-এর 'বীরবল সাহনি ইন্স্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি'র ডঃ আর. এন. লক্ষ্মণপাল দয়া করে এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেছেন এবং নানা প্রসঙ্গে আমাকে পরামর্শ দিয়ে বিপুলভাবে সাহায্য করেছেন।

অধ্যাপক সাহনির অসংখ্য গবেষণাপত্র থেকেও আমি নানা প্রসঙ্গ নিয়েছি। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে যেদিন এক প্রাণোচ্ছল কর্মপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেল সেদিন সারা বিশ্বের বিদ্বজ্জন এই বিরাট পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। এই বইয়ে আমি সেগুলিও ব্যবহার করেছি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদানের স্মারক হিসাবে আজ লক্ষ্ণৌ-এর 'ইন্স্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি' সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মৃত্যু যদি তাঁকে আরও কিছুদিন সময় দিত, তবে 'প্যালিওবোটানি' (উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান) এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞান-জগৎ আরও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু এক কবির কথায় 'কোমল হৃদয়ের মানুষ যাঁরা তাঁদের ডাক আসে সবার আগে, আর যাঁদের হৃদয় গ্রীষ্মের বালিকণার মত শুষ্ক তাঁরা মর্মস্থল পর্যন্ত জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে বসে থাকেন।'

নয়াদিল্লি

শক্তি এম. গুপ্তা

সূচীপত্র

এক

উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানী

1949 সালের 10 এপ্রিল মধ্যরাত্রে ভগবান বীরবল সাহনিকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন। কর্ম ও সাধনার বিপুল ব্যাপ্তিতে তিনি সেদিন রয়েছেন সর্বোচ্চ শিখরে, পৃথিবীর অগ্রগণ্য 'প্যালিও-বোটানিস্ট' বা উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানী হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর পরিচিতি।

1948 সালের সেপ্টেম্বর মাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা শেষ করে তিনি সবেমাত্র ভারতে ফিরে এসেছেন। তাঁর সামনে বিরাট কাজ। লক্ষ্ণৌ শহরে 'ইন্‌স্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি'র ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তাঁকে দেখাচ্ছিল ক্লান্ত, তাই পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাঁর সামনে যে বিরাট কাজ পড়ে রয়েছে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তাঁকে কিছুদিন আলমোড়ায় ঘুরে আসতে বলা হ'ল। কিন্তু অধ্যাপক সাহনির জিদ, এই মুহূর্তে তিনি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কোথাও যাবেন না, তাঁকে সংকল্পিত কাজ আগে শেষ করতে হবে। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল তিনি মৃত্যুর ডাক শুনতে পেয়েছেন এবং সেজন্যই তিনি একাজে আর বিলম্ব করতে চাইছেন না। অতিরিক্ত খাটুনি ও উদ্বেগ-উত্তেজনার ফলে 'করোনারি থ্রম্বসিস্' বা হৃদযন্ত্রের রক্তসঞ্চালনজনিত রোগে আক্রান্ত হলেন এবং সেটাই হ'ল তাঁর মৃত্যুর কারণ। ঘনিষ্ঠ বন্ধু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যেদিন 'ইন্‌স্টিট্যুট বা প্যালিওবোটানি'র ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে গেলেন, তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে সেই মর্মান্তিক মুহূর্তটি এল।

1949 সালের 3 এপ্রিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশের সামনে লক্ষ্ণৌয়ের 53 ইউনিভার্সিটি রোডে ইন্‌স্টিট্যুটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হ'ল। তিন ফুট দীর্ঘ এবং দুই ফুট প্রশস্ত এই মর্মর ফলকটিতে পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত থেকে সংগৃহীত 77টি দুর্লভ ফসিলের নমুনা বসিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে, নিজের বাসভবনে সেটাকে এক অপূর্ব-সুন্দর রূপ দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার এক অদ্ভুত পারম্পর্য যে প্রায় একই সময়ে পণ্ডিত নেহরুও কেম্ব্রিজে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। সাহনি ও নেহরু, উভয়েরই জন্মদিন 14 নভেম্বর।

নিয়তির এক নির্মম পরিহাস, মাত্র এক সপ্তাহ আগে যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ডঃ সাহনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে গেছেন, সেটিই তাঁর শেষ বিশ্রামের স্থান হয়ে রইল। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র ও সহকর্মীদের অশ্রুসজল চোখের সামনে তাঁর মরদেহ পূতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এক বিপুল প্রাণশক্তি যা ত্রিশ বছরেরও অধিককাল অক্লান্তভাবে কাজ করে গিয়েছে, বিজ্ঞান-জগতে 'প্যালিওবোটানি' বা উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানকে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে গিয়েছে, তা চিরদিনের জন্য বিশ্রাম নিল।

তাঁর জীবনের শেষ দশটি বছর লক্ষ্ণৌ শহরে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজেই কেটেছে। 1939 সালের কথা। দেশের বিদগ্ধ উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানীদের

কাজের মধ্যে একটি সমন্বয় আনা এবং সে কাজ কতদূর এগোল সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হ'ল। 1946 সালের 19 মে 'প্যালিওবোটানিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হ'ল। একটি ট্রাস্ট গড়ে তুলে জানিয়ে দেওয়া হ'ল 'এমন একটি গবেষণাগার গড়ে উঠতে চলেছে যার দৃষ্টিভঙ্গী হবে আন্তর্জাতিক, যেখানে থাকবে যাদুঘর, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি, গবেষকদের জন্য আবাসন ও আনুষঙ্গিক ঘরবাড়ি ত' থাকবেই।' অধ্যাপক সাহনিকে 'অনারারি ডিরেক্টর'রূপে গ্রহণ করে একটি 'গভর্নিং বডি' গঠিত হ'ল। এজন্য অর্থ আসতে লাগল নানা দিক থেকে। দু'টি বাণিজ্যিক সংস্থা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ও বর্মাসেল দু'টি গবেষণা 'ফেলোশিপের' ব্যবস্থাও করে দিলেন।

একদিন যা ছিল মর্মে এখন তা প্রকাশ পেল কর্মে—'প্যালিওবোটানিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুট' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। যদিও তিনি এই ইন্‌স্টিট্যুটের বীজ রোপণ করে গিয়েছেন, কিন্তু ওর পুষ্পায়িত হয়ে ওঠার আনন্দ শিহরণের দিনে তিনি আর নেই। ইন্‌স্টিট্যুটকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করা এবং সেটাকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়ার কাজটি রয়ে গেল তাঁর পত্নী শ্রীমতী সাবিত্রী সাহনির জন্য। প্রশংসনীয়ভাবেই তিনি সে কাজ করেছেন। ইন্‌স্টিট্যুটের আজ যে রূপ, তা যেন প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির সামনে শ্রীমতী সাহনির দুর্জয় সাহসিকতারই এক প্রতিলিপি। যাবার সময় অধ্যাপক শ্রীমতী সাহনিকে বলে গিয়েছেন ঃ 'ইন্‌স্টিট্যুটকে বড় করে তোলার কাজ রেখে গেলাম তোমার জন্য।'

দুই

পারিবারিক ইতিহাস

অধ্যাপক রুচিরাম সাহনি ও শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর তৃতীয় সন্তান অধ্যাপক বীরবল সাহনি। পশ্চিম পাঞ্জাবের (বর্তমানে পাকিস্তানে) শাহপুর জেলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের ছোট শহর ভেরায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন 1891 সালের 14 নভেম্বর।

1947-এর আগে যা' ছিল পাঞ্জাব স্টেট সেখানকার ভেরায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডেরা-ইসমাইল-খান থেকে পরিবারটি চলে আসে। ভেরায় জন্মগ্রহণ কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। লেখিকা তাঁর মা, অধ্যাপক বীরবল সাহনির কনিষ্ঠতম বোন শ্রীমতী লক্ষবন্তী মালহোত্রার কাছে শুনেছেন তাঁদের মা শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবী বিশ্বাস করতেন তাঁদের পারিবারিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি পারিবারিক গৃহেই সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রতিবারই লাহোর থেকে তিনি ভেরায় চলে আসতেন। বীরবল সাহনির ভূমিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারটিকেও তাঁরা এক শুভ-আবির্ভাব বলেই মনে করেছিলেন, কেননা, সে সময় ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল ; ভারতের সর্বত্র হিন্দুরা এটাকে একটি অব্যর্থ সুলক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

স্কুল-কলেজের ছুটির সময় প্রায়ই পরিবারটি ভেরায় চলে যেত। তরুণ বয়সী বীরবল বাবা ও ভাইদের সঙ্গে আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে, সেখানকার লবণ পাহাড়ে, বিশেষ করে, খেওড়ার লবণ পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। লবণ পাহাড় শ্রেণীর (Salt Range) শিলাস্তরে নানা উদ্ভিদের এমন অজস্র শিলীভূত দেহাবশেষ রয়েছে যে সেটাকে ভূবিজ্ঞানের একটি মিউজিয়ম বা যাদুঘররূপেই গণ্য করা যেতে পারে। হতে পারে, এই লবণ পাহাড় শ্রেণী দেখেই ভূবিজ্ঞান ও উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান সম্পর্কে তরুণ বীরবলের মনে প্রথম ঔৎসুক্য জেগেছিল। পরবর্তীকালে অধ্যাপক সাহনি এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক প্রাচীনতা সম্পর্কে মূল্যবান অবদান রেখে গিয়েছেন।

ভূতাত্ত্বিক বা বিজ্ঞানীরূপেই অধ্যাপক সাহনির সবটুকু পরিচয় নয় ; তিনি ছিলেন এক অনন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি—যদিও তিনি তাঁর ধর্মীয় মতামত নিয়ে কখনও আলোচনা করতেন না। চরিত্রবান, উদার ও স্বার্থত্যাগে সদা-উন্মুখ মানুষটি এসকল গুণ পেয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। বাবা রুচিরাম ছিলেন এসকল সদ্‌গুণের মূর্ত বিগ্রহ। গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। শুধু তাই নয় ; সমাজ-সংস্কারে, বিশেষকরে, নারী সমাজের মুক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী।

আদিতে এই পরিবারটির বাস ছিল সিন্ধু নদের তীরে ডেরা-ইসমাইল-খান-এ। সে আমলে এটি ছিল একটি বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র। পারিবারিক ভাগ্যবিপর্যয় এবং পিতার মৃত্যু—যে পিতা এক সময় ব্যাংকিং ব্যবসায়ে নেমে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন—এই দুই ঘটনার ফলে রুচিরামকে অতি অল্প বয়সেই ডেরা-ইসমাইল-খান থেকে চলে আসতে হয়।

লেখিকা তাঁর স্কুলের পাঠ্যাবস্থাতে ঠাকুর্দা রুচিরাম সাহনির সংগে কাশ্মীরের গুলমার্গে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে গিয়ে এই পারিবারিক কাহিনী জানতে পেরেছেন। অধ্যাপক রুচিরাম সাহনি যে কেমন শক্ত ধাঁচের মানুষ ছিলেন তা তাঁরই মুখ থেকে শোনা কাহিনীতেই পরিস্কার বোঝা যেতে পারে। সন্দেহ নেই এই ধাঁচটি পুরুষানুক্রমে পুত্র বীরবলের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। এখানে একটি সামান্য অথচ তাৎপর্যে অসামান্য ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিবারটি যখন ডেরা-ইসমাইল-খান্-এর প্রাসাদোপম বাড়ি থেকে সে শহরেরই একটি ছোট্ট বাড়িতে চলে এল এবং সব রকমের বিলাসিতা তাদের বর্জন করতে হল। রুচিরাম সাহনি তাঁর বাবার কাছে এসে নালিশ জানাল যে তার সিল্কের শার্ট নেই, কানে সোনার ইয়ার-রিং নেই এবং হাতে বালা নেই দেখে তাঁর খেলার সংগীরা তাঁকে ক্রমাগতই টিটকারি দিয়ে চলেছে। সে আমলে এ ধরনের পোশাক ও অলঙ্কার ছিল সচ্ছল পরিবারের লক্ষণ। কথাটি শুনে তাঁর বাবা বললেন ঃ 'চারদিকে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এবার যতটা সম্ভব, বর্ষণ শুরু হোক্। কিন্তু তাতে কী? বর্ষার জলে বাইরের কাপড়-চোপড় ভিজবে, কিন্তু ভেতরের আত্মা? মেঘ বা বর্ষাবাদলে সেই আত্মা কখনও সিক্ত হয় না। অপেক্ষা করো, এই দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ একদিন কেটে যাবে।'

কিন্তু, এধরনের কথা বলা যত সহজ, কাজে দেখানো তত সহজ নয়। হতাশা ও নৈরাশ্যে পীড়িত বাবা যখন মারা গেলেন, তখন রুচিরাম একটি নাবালক শিশুমাত্র। যে ডেরা-ইসমাইল-খান-এ পরিবারটির যথেষ্ট মর্যাদা ও ধনসম্পদ ছিল, সেখানে হৃতসর্বস্ব হয়ে বাস করা চলে না। কিন্তু, এই একটি মাত্র ধাক্কা খেয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার পাত্রও ছিলেন না রুচিরাম। বিদ্যোপার্জনের অদম্য সংকল্প নিয়ে একগাদা বই-পুস্তক পিঠে তুলে তিনি পায়ে হেঁটেই চললেন দেড়শ' মাইল দূরে ঝাং-এর (পশ্চিম পাঞ্জাবের একটি শহর, বর্তমানে পাকিস্তানে) দিকে। বৃত্তি হিসাবে পাওয়া মাত্র কয়েকটি টাকার ওপর নির্ভর করে তাঁকে বিদ্যার্থীর পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে হল। যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল এই ছেলেটি, দেখলেই মনে হ'ত তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বৃত্তি বা কোনরূপ অনুদান সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু, জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই তাঁর সামনে বাধার প্রাচীর। ঝাং-এর পথে একটি ঘটনার কথা তিনি নিজেই এই লেখিকাকে বলেছেন, যা মনে শিহরণ জাগিয়ে তোলে। দেড়শ' মাইল দূরে ঝাং, পায়ে হেঁটে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। রাত আসছে, সান্ধ্য-মুহূর্তে তিনি একটি জায়গায় এসে থামলেন। কোথায় রাত কাটাবেন সেটাই সমস্যা। হাতে সম্বল একগাদা বই, পকেটে এক টাকা পঁচিশ পয়সা—অবশ্য, তাঁর মতো একটি দরিদ্র কিশোরের কাছে সেটাই ছিল এক বিরাট অংক। তবুও ওই সম্বল নিয়ে কোন সরাইখানায় রাত কাটাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সামনে দুটি পথ ঃ (১) রাতটি কারো এক আস্তাবলে কাটানো ; (২) রাস্তার পাশে কোন গাছে চড়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া। কিন্তু এখানেও সমস্যা। আস্তাবলে রাত কাটাতে গেলে তাঁর মূল্যবান সম্পদ, অর্থাৎ বই-পত্র চুরি হয়ে যেতে পারে। অতএব, কিশোরটি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিল, অর্থাৎ গাছে চড়ে বসল কিন্তু চোখ বুজল না। আশঙ্কা, গাছের ডালে ঘুমিয়ে পড়লে সে পড়ে যেতে পারে। এমন কঠিন অবস্থায় ছাত্রজীবন শুরু করে নিজের পরিশ্রম ও প্রতিভা প্রয়োগ করে তিনি একদিন লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে লাহোরই তাঁদের পারিবারিক গৃহ হয়ে উঠেছে, ভেরার কথা চলে গেছে পেছনে, যদিও পরিবারটির পরিচিতি এখনও 'ভারুচি' বা ভেরার অধিবাসীরূপেই রয়ে গিয়েছে।

প্রফেসর রুচিরাম সাহনি তাঁর পাঁচ ছেলেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড পাঠালেন এবং নিজেও ইংল্যাণ্ড গেলেন। মানচেস্টারে গিয়ে তিনি কেম্ব্রিজের অধ্যাপক আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের সঙ্গে একযোগে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে গবেষণায় লেগে গেলেন, কাজ করলেন কোপেনহেগেনের বিজ্ঞানী নিয়েল্‌সবোরের সঙ্গেও। প্রথম মহাযুদ্ধ যেদিন ঘোষিত হল সেদিন তিনি রয়েছেন জার্মানীতে। লড়াই আরম্ভ হবার একদিন আগে কোনক্রমে সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি নিরাপদ স্থানে পৌঁছন। বাস্তবিক, রুচিরামের কর্মোদ্যোগ, অনুপ্রেরণা, সাহস, নিষ্ঠা ও বিপুল শ্রমশক্তি বহুলাংশে তাঁর পুত্র বীরবলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঞ্চার করে দিয়েছিল এবং সে ধাঁচেই তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তাই আমরা দেখতে পাই বীরবল সাহনি তাঁর গবেষণাকর্মে কখনও পরাজয় স্বীকার করলেন না। যত কঠিন সমস্যাই হোক না কেন, তিনি তাঁর সমাধানে সর্বদাই প্রস্তুত। এ এমন এক জীবন-দর্শন যা সমগ্র জীবনটিকেই একটা বৃহৎ চ্যালেঞ্জরূপে মেনে নেবার আদর্শরূপে গ্রহণ করতে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে।

অধ্যাপক বীরবল সাহনি স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। এটা সম্ভবতঃ তাঁর জীবনে পিতৃপ্রভাবেরই ফল। পিতা রুচিরাম 1922 সালে অসহযোগ আন্দোলনের দিনে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরকারী খেতাব বর্জন করেছিলেন। তাঁর পেনসন বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি সত্ত্বেও তিনি পেছনে হটে আসেননি। তিনি সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাজের ফলাফলের জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার জোর এত বেশী ছিল যে ব্রিটিশ সরকার তাঁর পেনসন স্পর্শ করতে সাহস পেল না এবং তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পেনসন ভোগ করে গিয়েছেন।

ভারত-ইতিহাসের সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দিনগুলি। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষোভ ও আলোড়ন তখন তুঙ্গে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রতিটি প্রাণ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের কাজে কোন-না-কোন উপায়ে নিবেদিত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমত এই সংগ্রামে সহায়তা করে চলেছে। এমন দিনে, ভারতের ভাগ্য যেদিন নির্ধারিত হতে চলেছে, তখন তাঁদের লাহোরের বাড়িতে এসেছেন একে একে মতিলাল নেহরু, গোখলে, দেশবন্ধু দাশ, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সরোজিনী নাইডু, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য, হাকিম আজমল খান আরও অনেকে। এঁদের উপস্থিতি, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা তরুণ বীরবলের রাজনৈতিক চিন্তাধারার গতিপথ স্থির করে দিয়েছে। বাড়ির কাছেই 'ব্রাডলে হল'—পাঞ্জাবের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র। প্রায় প্রতিদিনই সেখানে শোনা যেত অমুক জায়গায় অমুক গ্রেফতার হয়েছেন, অমুক জায়গায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সভা চলছে, কোথাও কাঁদানে গ্যাস, কোথাও বা গুলি, বাইরে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার আঘাত যেন এসে পড়ছে 'ব্রাডলে হল'-এর প্রাচীরে, ভারত জুড়ে এক ইতিহাস রচিত হয়ে চলছে। তরুণ বীরবলের সংবেদনশীল মনের ওপর এসকল ঘটনার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। বিদেশে পড়াশুনা শেষ করে 1918 সালে ভারতে ফিরে আসার অল্পপরেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে বাস্তব রূপ দিলেন এবং হাতে-কাটা খাদি পরতে শুরু করলেন।

বীরবল সাহনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। এই বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবতঃ পেয়েছিলেন তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে। আত্মত্যাগে সদা উন্মুখ জননী যদিও ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন গোঁড়া, যদিও তাঁর চালচলন ছিল সাদাসিধে, তথাপি পাঞ্জাবী নারীর যা' বৈশিষ্ট্য—বুকে বল ও

মনে প্রচণ্ড সাহস নিয়ে তিনি এই সংসারটিকে বহু সংকটের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। নিজে অত্যন্ত রক্ষণশীল, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরাও তাই ; তথাপি তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একমত হয়ে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশের সামগ্রিক অবস্থায় এটাকে এক বলিষ্ঠ, বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলেই গণ্য করা হত। বাস্তবিক, প্রতিটি ছেলেমেয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য তিনি যে প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, তাই তাঁদের পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। অধ্যাপক রুচিরাম সাহনির তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী লীলা কোহলি লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েটের গৌরবের অধিকারিণী হয়েছিলেন। সে আমলে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া ছিল সামাজিক রেওয়াজ, ঈশ্বরী দেবীও মেয়েদের বেশী বয়সে বিয়ে দেওয়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু এব্যাপারে তিনি স্বামীর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিলেন, পরিবারের মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেবার জন্য স্বামীর ওপর কোন চাপ দিলেন না।

বীরবল যখন বালকমাত্র তখনই সে তার মানবিক অনুভূতির জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পেরেছিল। ভাইবোনদের মধ্যে কলহ বাধলে বীরবলকেই অনিবার্যভাবে তা মিটিয়ে দিতে হত। কেননা, তারা সকলেই জানত বীরবলের কাছে ন্যায় বিচার আশা করা যায়। এই উক্তি থেকে যদি কারো ধারণা হয়ে থাকে যে বীরবল খুব গুরুগম্ভীর মেজাজের লোক ছিলেন, সেজন্য একথাটিও বলে রাখা ভাল যে মজার মজার ব্যাপার সৃষ্টিতে তার জুড়ি কেউ ছিল না ; ছোট ভাইবোনদের সে এমন সব দুষ্টুমিতে ঠেলে দিত যে সেজন্য তার বাবাকে কোন কোন সময় দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হত। দুষ্টুমির এই প্রবণতা ছিল নানা ধরনের। একবার গরমের কয়েক মাস ছুটি কাটাবার জন্য পরিবারের সকলে মিলে সিমলা গেলেন ; সেখানে আত্মীয়-স্বজনের সংগে রইলেনও একই বাড়িতে। সেখানে একটি বাগান ছিল, সব্জির বাগান। বাগানে জন্মানো হয়েছিল ভুট্টা ও শশা। কোন এক কারণে বীরবলের পরিবারকে অকস্মাৎ লাহোরে ফিরে যেতে হল। বীরবল দেখলেন এসময় তারা লাহোরে চলে গেলে ওই ভুট্টা ও শশাগুলি জুটবে প্রতিবেশীদের ভাগ্যে। দুষ্টবুদ্ধি বীরবল এই সম্ভাবনা সহজে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি মতলব আঁটলেন, লাহোর যাত্রার আগের রাত্রিরে সবগুলি পাকা ফল তুলে নিয়ে আসবেন এবং যাতে এই অনিষ্টকর কাজটি ধরা না পড়ে, সেজন্য সব কয়টির শেকড় কেটে মাটি চাপা দিয়ে রাখবেন। ভাইবোনেরা একজোট হয়ে পরিকল্পনা-মত এই কাজ সেরে ফেলল এবং গাছগুলিও শীঘ্রই মরে গেল। প্রতিবেশীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, তাড়াতাড়ি গাছগুলির গোড়ায় সার দিলেন, জল দিলেন, কিন্তু সেগুলি আর বেঁচে উঠল না। তাদের যে কিভাবে ঠকানো হয়েছে, এটা বুঝে নিতে প্রতিবেশীদের অনেক দিন কেটে গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে বীরবলরা লাহোরে পৌঁছে গিয়েছে। এই যে লোকের সঙ্গে তামাসা করে চলার অভ্যাস, তা কিন্তু পরিণত বয়সেও তাঁর বজায় ছিল। বয়স বাড়লেও তিনি তাঁর অল্প বয়সী ভাইপো ও ভাইঝিদের নিয়ে মজা করতেন, শুধু কথায় নয়, কাজেও। উদ্ভিদবিদ্যা-সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধানে তিনি তাঁর সঙ্গী ছাত্রদের সঙ্গেও মজার মজার গল্প করে চলতেন, তাদের নানা রসালো কাহিনী শোনাতেন। তাই ভাইপো ও ভাইঝিদের কাছে তিনি ছিলেন 'মজার খুড়ো'। একটা দস্তানাওয়ালা খেলনা-বানরকে নিয়ে মজার খেলা দেখাতে তিনি বেশী ভালবাসতেন। পুতুলটি তিনি কিনে এনেছিলেন জার্মানী থেকে 1913 সালে। মিউনিকে ছ' মাসের এক গ্রীষ্মকালীন পাঠক্রমে অধ্যাপক গোয়েবেলের উদ্ভিদবিদ্যাসংক্রান্ত বক্তৃতা শুনতে

গিয়ে তিনি সেখান থেকে এটি সংগ্রহ করে আনেন। দস্তানা-পরা বানরটিকে তিনি এমনভাবে ধরে রাখতেন, সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন যে সকলেই ওটিকে সত্যিকার বানর-শিশু বলে ভুল করে বসত। দস্তানা-পরা নকল বানর-শিশু কেবলমাত্র বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদেরই যে আনন্দ দিত, তা কিন্তু নয়। নববিবাহিত সাহনি ও তাঁর সলজ্জ স্ত্রীর মধ্যে যে সংকোচের আবরণ ছিল, নকল বানর তাও সরিয়ে দিয়েছিল।

যুবক সাহনি বিয়ে করেছেন, স্ত্রীর সংগে প্রথম সাক্ষাৎ। বর বা বধূ, কারো মুখেই কথা ফুটছে না। এক অসহনীয় সংকোচ ও নিঃশব্দতা। সাহনির কোটের পকেট থেকে একটি বানরের বাচ্চার মুখখানা দেখা যাচ্ছে এবং তার চোখ দুটো পিটপিট করছে। সেটিকে দেখিয়ে সাহনি নব বধূকে বললেন, 'এটি আমার পোষা বানর, এটিকে ভালওবাসি খুব। এতদিন আমি একাই ওকে লালন-পালন করেছি। কিন্তু আজ থেকে, আমার ইচ্ছা, তুমিই ওর যত্ন-আত্তি করবে। নাও, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, ও তোমার ভালবাসা চাইছে।' ওটা যে একটি খেলনামাত্র, আসল বানর নয়, তাঁর স্ত্রী কিন্তু তখন বুঝতে পারেননি। তাই ওটাকে স্পর্শ করতে তাঁর সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু মহিলাটি ধীরে ধীরে আরও কাছে চলে এলেন এবং অবশেষে বুঝতে পারলেন ওটি একটি পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বামী তাঁকে নিয়ে মজা করলেন 'এই যা'। এবার দু'জনই হাসিতে ফেটে পড়লেন এবং উভয়ের সংকোচ ও জড়তা একদম কেটে গেল। এই নকল বানরটির সংগে সাহনির জীবন এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, তাঁর কথা উঠলেই বানরটির কথা এসে যায়। দেখতে বিমর্ষ অথচ মানবিক অভিব্যক্তিতে পূর্ণ এই ভাগ্যবান 'ম্যাসকট'টি সর্বত্র তাঁর সংগে গিয়েছে ; সমুদ্রপথে, আকাশপথে, স্থলপথে তাঁর সংগী হয়েছে। ফসিলের খোঁজেই হোক বা প্রমোদ ভ্রমণের জন্যই হোক, এমন কোন দেশ ছিল না যেখানে বানরটি তাঁর সংগে যায়নি। সাহনি তাঁর আদরের পুতুলটির নাম রেখেছিলেন 'গিম্পি'। আজ প্রভুর মৃত্যুর পরে তাঁর সংগৃহীত মূল্যবান জিনিসগুলির মধ্যে এটিরও স্থান হয়েছে। যথাসময়ে 'ইন্‌স্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি'তে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে এটি রাখা হয়েছে।

সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার পরিবেশে বীরবলের জীবন গড়ে উঠেছিল। সে সময় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি ছিল না বলে এম. এস-সি পড়ার জন্য বাবা কলকাতায় চলে যান। এটা এমন এক সময়ে যখন কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে উঠেছে। সেখানে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। কলকাতার প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে তিনি লাহোরে ফিরে আসেন। ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক বিরাট আলোড়নরূপেই দেখা দিয়েছিল। যে সকল প্রাচীন রীতি-নীতি ও বিশ্বাস সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে তাদের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে অর্থহীন হয়ে পড়েছে, তাদের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার এক প্রচণ্ড প্রয়াস ছিল এই আন্দোলন। প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় এই আন্দোলন জাত-পাতের প্রশ্নকে সোজাসুজি অস্বীকার করল। রুচিরাম কলকাতা থেকে ফিরে লাহোরের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন। যে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কলকাতা থেকে ফিরে আসেন, তাকে কার্যকর রূপ দিতে গিয়ে তিনি বড় ছেলে ডঃ বিক্রমজিৎ সাহনির বিয়ে দিলেন তাঁদের জাতের বাইরে। সমাজের যাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি সাফ বলে দিলেন, 'সাহস থাকে তো আমাকে সমাজচ্যুত করে দাও।' উঁচু গলায় যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, দেখা গেল, সামাজিকভাবে রুচিরামকে 'বয়কট' করার সাহস তাঁদের কারোরই হল না।

লাহোরের বাড়িতে ধর্ম, জাত-পাত বা আচার-বিচারের কোন বাধার গণ্ডী ছিল না, সর্বধর্মের লোকেরই সে বাড়িতে অবিরাম অনায়াস যাতায়াত—রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আলোচনা চলত অবাধে। পাঞ্জাবে আর্যসমাজ যখন সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কারের কার্যসূচি নিয়ে আন্দোলনে নামল, তখন লাহোরে যে-সকল বুদ্ধিজীবী এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলেন, তাঁদের মধ্যেও রুচিরাম সাহনিকে দেখা গেল। বীরবল সাহনি এমন এক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন যেখানে সকলেই আশা করতেন যে, ছেলেমেয়েরা গুরুজনের বাধ্য থাকবে ; আবার কনিষ্ঠদের মতামতকেও মর্যাদা দেওয়া হবে। বীরবলের কনিষ্ঠ ভাই ডঃ এম. আর. সাহনির উক্তি থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে ঃ 'বীরবলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাবা ভেবে রেখেছিলেন যে, সিভিল সার্ভিসে গেলেই ও ভাল করবে এবং তদনুযায়ী বীরবলকে ইংল্যাণ্ড যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলা হল। সবাই জানত, এবিষয় নিয়ে বাবার সংগে বেশী তর্ক-বিতর্ক চলবে না। আমার পরিষ্কার মনে আছে বাবার এই প্রস্তাবের জবাবে বীরবল বলেছিল, এটা যদি হুকুম হয়, তবে সে অবশ্যই বিলাত যাবে, কিন্তু যদি তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাটি ভেবে দেখা হয়, তবে সে উদ্ভিদবিজ্ঞানে গবেষণার পথটিই বেছে নেবে। অন্য কিছুর প্রতি তার টান নেই। এ ধরনের জবাব শুনে বাবা প্রথমে কিছুটা অবাক হলেন বৈকি, কিন্তু সংগে সংগে বীরবলের প্রস্তাবে সম্মতিও দিয়ে দিলেন। বাবা ছিলেন চিন্তায় ও কর্মে কঠোর, নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাসী কিন্তু প্রয়োজনবোধে তিনি সকলকেই নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে, তাঁর নিছক একটি অভিমত থেকেই বুঝে নিতে হত তিনি কি চাইছেন।' বীরবল সাহনির বাল্য ও কৈশোর এমন এক পরিবেশে কেটেছিল যেখানে বড়দের কথা মেনে চলতে হত, আবার সংগে সংগে প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী ভাবনা-চিন্তা ও কাজের অধিকার থাকত। এ এমন এক পরিবেশ যেখানে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিরামহীন বিদ্রোহ চলছে, আবার তারই সংগে উচ্চশিক্ষার জন্য সকলের আপ্রাণ চেষ্টাও চলছে।

তিন

স্কুল ও কলেজের শিক্ষা

সাহনির ছেলেবেলার পড়াশোনার সবটাই হয়েছে ভারতে। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হন এবং বিখ্যাত ব্রায়োলজিস্ট অধ্যাপক শিবরাম কাশ্যপের কাছে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন। অধ্যাপক কাশ্যপই সাহনিকে উদ্ভিদবিদ্যা তাঁর প্রধান পঠনীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেন। গাছপালার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে, কচি বয়সেই তা' ধরা পড়ল। লতাপাতা জোগাড় করে এনে সংগ্রহশালা বা 'হার্বেরিয়াম' তৈরী, নতুন গাছপালা খুঁজে নিয়ে আসা বা ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেগুলি বোতলের মধ্যে রেখে দেওয়া—এ সকল ব্যাপারে বাড়ির লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। গভর্নমেন্ট কলেজে যখন তিনি পড়াশোনা করছেন, তখন থেকেই তিনি বাড়ির বাইরে খোলা জায়গায়, নগর প্রাচীরের বাইরে, 'ব্রাডলে হল'-এর আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। অ-দেখা কোন উদ্ভিদ চোখে পড়লেই তিনি সেটাকে উপড়ে তুলে নিয়ে আসতেন এবং নিজের বাড়ির বাগানে সেটাকে বসিয়ে দিতেন। এভাবে চলতে চলতে একদিন তাঁর চোখে পড়ল সোঁদাল ফুলের (Cassia fistula) গাছের একটি চারা, যার চলতি নাম হচ্ছে Amaltas, বা 'স্বর্ণসিঞ্চন'। 'স্বর্ণসিঞ্চন' নাম দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, ওর সোনালি-পীতবর্ণের পাপড়িগুলি গাছ থেকে ঝরে পড়লে দূর থেকে মনে হয় যেন সেখানে স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই আবিষ্কারে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বীরবল রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যান বাড়িতে এবং ছোট ভাই-বোনরা-সহ এক দঙ্গল বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেই চারা গাছটির কাছে গিয়ে মাটি খুঁড়ে সেটাকে তুলে নিয়ে এসে নিজেদের বাগানে পুঁতে দিল। কয়েক বছর পর সেই চারাটি যখন পরিণত হয়ে উঠল এবং মাটির ওপর পীতবর্ণের ফুল ছড়াতে আরম্ভ করল, তখন বাড়িতে আর আনন্দের সীমা রইল না। দূরের গ্রাম থেকে আত্মীয়-স্বজনরা নানা অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য অবশ্যই এর ফল কুড়িয়ে নিতেন এবং বীরবলকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়ে যেতেন। দেশ ভাগ হবার পর যে বিপর্যয় শুরু হয়ে গেল, সেদিন অন্যদের সংগে সাহনি পরিবারকেও লাহোর ছেড়ে চলে আসতে হল। কিন্তু গাছটি সেদিনও ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে 'ইণ্ডিয়ান লেবারনাম'-এর (Indian Laburnum) জন্য সাহনির প্রীতি আজ প্রায় এক লৌকিক উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ-এ গোমতীর তীরে যখন তাঁর বাড়ি তৈরি হল, তখন রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি সারি এই গাছ লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ আকাশের পটভূমিকায় পীতবর্ণের ফুলগুলি যখন রাস্তার দিকে নুয়ে পড়ে এবং গোমতীর জলে সেই সৌন্দর্য প্রতিবিম্বিত হয়, তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। শহরে প্রবেশের পথে এই অপরূপ সৌন্দর্যের কথা না বলে কেউ থাকতে পারেন না।

বীরবল সাহনি 1911 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি ডিগ্রী পান এবং সে

বছরেই ইংল্যণ্ড গিয়ে কেম্ব্রিজের ইমানুয়েল কলেজে ভর্তি হন। 1914 সালে কেম্ব্রিজের স্নাতক হয়ে তিনি সে সময়ের সর্বাধিক পরিচিত উদ্ভিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. সি. সুআর্ডের সরাসরি নির্দেশনায় গবেষণায় নিযুক্ত হন। ফসিল উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁর গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় 1919 সালে তাঁকে ডি. এস-সি ডিগ্রী দিয়ে ভূষিত করেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং ভারতের গাছপালা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এত বেশী ছিল যে, তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে ভারতের উদ্ভিদবিজ্ঞানের ছাত্রদের উপযোগী করে লসন্-এর লেখা বইটির কালোপযোগী সংশোধন করে দিতে বলা হয়েছিল। ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজও উদ্ভিদবিজ্ঞানের ওপর লেখা লসন্ ও সাহনির বইখানা বহু পঠিত। এই বিরাট কাজের জন্য সাহনিকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র কুড়ি পাউণ্ড। রয়েলটি হিসাবে কিছুই তিনি পেলেন না। এর চেয়েও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া হয়েছিল যে, সারাজীবন তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানের এমন কোন পাঠ্যবই লিখবেন না যার ফলে এই বইয়ের বিক্রি কমে যেতে পারে।

চার

দেশ-বিদেশে ভ্রমণ

অধ্যাপক সাহনি যথেষ্ট ভ্রমণ করেছেন ; কেবলমাত্র ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীর নানা দেশে তিনি বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছেন। ভারতে তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করত হিমালয়। হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, হিমালয়ের সর্বত্র ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। ঘুরে বেড়ানোর এই নেশা তিনি পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে। ছেলেমেয়েরা যখন বলতে গেলে শিশু, তখনই তিনি তাদের কয়েকবার হিমালয় ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছেন। বীরবল যৌবনেও বহুবার হিমালয় পরিক্রমা করেছেন। গিয়েছেন পাঠানকোট থেকে রোটাং (12 হাজার ফুট) গিরিপথ পর্যন্ত ; কাল্‌কা থেকে কশৌলি, সাবাথু, সিমলা, নারকুণ্ডা, রামপুর, বুশার, কিলবা ও বুরান গিরিপথ (16,800 ফুট) ধরে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত ; জোজি-লা গিরিপথ অতিক্রম করে শ্রীনগর থেকে দ্রাশ ; শ্রীনগর থেকে অমরনাথ (14 হাজার ফুট) ; সিমলা থেকে রোটাং গিরিপথ এবং আরও বহু স্থানে। পায়ে হেঁটে গিয়েছেন তিব্বত সীমান্তে। 1911 সালের গ্রীষ্মকালে ইংল্যণ্ড যাত্রার আগে জোজি-লা গিরিপথের অদূরে ম্যাচয় হিমবাহ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার কালে তিনি তুষার স্তূপের মধ্যে রক্তবর্ণের এক জাতের দুর্লভ শ্যাওলা খুঁজে পান। এই নমুনাটি তিনি ইংল্যণ্ড নিয়ে গেলেন এবং 'কেম্ব্রিজ বোটানি স্কুল'-এর অধ্যাপক সুআর্ডকে দিয়ে তা পরীক্ষা করিয়ে নেন। ম্যাচয় তুষারস্রোতে যাবার পথে নিচে একটি গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে তিনি যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ; নিচে প্রায় অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে একটি ঘোড়া তুষারে জমে গিয়ে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায়, সেই তুষার সমাধিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ! দামে সস্তা এবং তুষার প্রান্তরে পিছলে পড়ার আশঙ্কা থাকে না বলে স্থানীয় লোকেরা যে ধরনের চপ্পল পরে ঘুরে বেড়ায়, সেই চপ্পল পায়ে দিয়ে এবং স্থানীয় একজন গাইড ও তাঁর সংগী ভাইদের নিয়ে তিনি সে দিকেই এগিয়ে চললেন। কিন্তু, হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, এই জমাট তুষার-প্রবাহে চলতে গিয়ে যদি একটিবারও পা ফেলতে ভুল হয়, তবে তিনি ও তাঁর সংগীরা ওই দুর্গম তুষার গহ্বরে একদা শিলায় রূপান্তরিত হয়ে ওই ঘোড়াটির মতো অনন্তকাল অনড়-অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। ছাত্রজীবনে পর্যটনের কথা হিসাবের মধ্যে না ধরলেও তিনি ভারতের বাইরে গিয়েছেন বহুবার—কোথাও বক্তৃতা দিতে, কোথাও বা আলোচনা সভায় যোগ দিতে, বিশ্ববিদ্যালয় বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান দেখতে আবার কোথাও কোন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসাবে। বিয়ের পর এসকল সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ ভ্রমণে তাঁর নিত্যসংগী ছিলেন শ্রীমতী সাহনি। এমনই একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শ্রীনগর থেকে উরি হয়ে তাঁরা পুঞ্চ যাবেন, সেখান থেকে চোর পাঞ্জাল ও পাল গাগ্রিয়ান এবং অবশেষে গুলমার্গ। 'এ্যাডভেঞ্চার'-এর নেশা, নতুন জায়গার ডাক শুনে উতলা হয়ে ওঠা, এ সমস্তই তাঁকে কোন কোন

সময় বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এমনই এক ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি ও তাঁর সংগীদল অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমতী সাহনি এবং অল্প কয়েকজন মালবাহককে সংগে নিয়ে তিনি অনেকটা উঁচুতে তাঁবু খাটালেন। সন্ধ্যা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রবল তুষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সে এমন প্রচণ্ড তুষারবর্ষণ যে, সকলেরই দিশাহারা হবার উপক্রম। এই তুষার-প্রান্তরে যাঁরা ঠিকমতো পা ফেলে চলতে পারতেন, যাঁরা শক্ত-সমর্থ মানুষ, তাঁদের সকলকেই তিনি সময় থাকতে নিরাপদ স্থান খুঁজে নেবার জন্য নিচে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কুলিরা নিচে নেমে গেল। আর সেই তুষার-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তুষারে সমাহিত হবার জন্য নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সাহনি এবং তাঁর পত্নী। চারদিকে সব কিছু জমে তুষার হয়ে যাচ্ছে, তীব্র শীত ; এক দুঃসহ রাত্রিতে তাঁবুর মধ্যে আর কেউ ছিল না, শুধু তাঁরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী। সৌভাগ্যের কথা, একজন কুলি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে অন্যদের জানিয়ে দিয়েছিলেন অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নী তুষারের মধ্যে আটক পড়ে আছেন। এই পর্বত অভিযানের জন্য সাহনি যে কুলিদের ভাড়া করে নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলে একই গ্রামের লোক এবং সেই গ্রামের মোড়ল উপস্থিত থেকে ভাড়ার ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা করে দিয়েছিলেন। সাহনি-দম্পতির এই বিপদের কথা কানে যেতেই সেই গ্রাম্য-সর্দার একটি উদ্ধারকারী দল পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে অধ্যাপক সাহনি 'বাইনোকুলার' দিয়ে দেখতে পেলেন, একটি উদ্ধারকারী দল তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটি চোখে দেখেও তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সাহনি-দম্পতিকে উদ্ধার করার জন্য যাঁরা আসছেন, তাঁরা শক্ত-সমর্থ ও তাগড়া চেহারার লোক এবং সে অঞ্চলের পথ-ঘাট সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। পরে হাঁটু পর্যন্ত গভীর তুষার প্রবাহ ঠেলে তাঁরা নিচে নামলেন।

অনেকেই খবর রাখেন না যে, একজন বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর। সংগীতপ্রিয় অধ্যাপক সেতার ও বেহালা দু'টিই বাজাতে পারতেন। অঙ্কন বিদ্যা ও মাটির 'মডেল', এগুলি ছিল তাঁর 'হবি', আবার সময় পেলেই দাবা খেলা নিয়ে বসে যেতেন। খেলা-ধুলো ভালবাসতেন সেই ছেলেবেলা থেকেই, পরিণত বয়সেও খেলা-ধুলোর ব্যাপারে এই উৎসাহ তাঁর বজায় ছিল। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় তিনি হকি খেলায় মেতে উঠতেন এবং হকির একাদশে স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে তিনি 'ইণ্ডিয়ান' মজলিশের হয়ে 'অক্সফোর্ড' মজলিশের বিরুদ্ধে টেনিসও খেলেছেন।

অধ্যাপক সাহনি ছিলেন প্রধানতঃ একজন 'প্যালিওবোটানিস্ট' বা উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানী এবং ভূবিজ্ঞানীও বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন প্রত্নবিদ্যা ও প্রাচীন মুদ্রাসংক্রান্ত বিদ্যার ক্ষেত্রেও তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল।

পাঁচ

উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান

ভূবিজ্ঞানের দিক থেকে যা সুদূর অতীতকাল বলে গণ্য করা হয়, সে সময়কার তরুলতা বিজ্ঞানের যে শাখার বিষয়ীভূত হয়ে আছে, তাকেই বলে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে রয়েছে উদ্ভিদের ফসিলের ওপর অথবা শিলাস্তরে রক্ষিত উদ্ভিদের দেহাবশেষের ওপর। এ-সকল ফসিল বা ফসিলকল্প পদার্থগুলি পাওয়া যায় পাতা, বীজ, ডাল-পালা, রেণু, পুষ্প, ফল বা কাষ্ঠখণ্ডরূপে, কিন্তু আগা-গোড়া ফসিলে পরিণত উদ্ভিদ-দেহ কদাচিৎ অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায়। অতীত ইতিহাসের প্রমাণচিত্র হিসাবে এসকল ফসিল দেখে যে কোন বিশেষ শিলার বয়স নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়। কেননা, একটি নির্দিষ্ট পাললিক শিলাস্তরে বা স্তর সমষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনই থাকতে পারে। পৃথিবীর জীবনে যুগের পর যুগ কেটে গিয়েছে এবং সেই সংগে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈহিক গঠন জটিলতর রূপ নিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের ফসিল-রেকর্ড দেখেই তা' পরিষ্কার বোঝা যায়। ফসিলকে indicator বা 'নির্দেশক'রূপে গ্রহণ করে শিলার বয়স নিরূপণ করতে গেলে সেই বিশেষ শিলাস্তরে কয়েকটি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের বা প্রাণীর শিলীভূত কঙ্কালের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের দ্বারাই তা প্রমাণিত হতে পারে। পনেরো শত কোটি বছর আগে Proterozoic যুগে যে জলজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল, ফসিলের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। Palaeozoic বা পুরাজীবীয় যুগের শিলুরীয় পর্বে যে-সকল শিলাস্তর গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে আমরা প্রথম স্থল-উদ্ভিদ দেখতে পাচ্ছি। আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র, গঠনে অত্যন্ত সরল উদ্ভিদ-কণিকা বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে এসে আজকের দিনের গুপ্তবীজী (Angiosperm) বৃক্ষের রূপ পেল, কিভাবেই তা তাদের গঠন কৌশলের উন্নতি ঘটল, বিভিন্ন অংগের বিকাশই বা কিভাবে ঘটল, সে-সকল প্রশ্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের সংগে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

উদ্ভিদ ফসিলের স্তরবিন্যাসের ব্যাপারটি ভূবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে শিলার বয়স জানা আছে, তার সংগে যদি অন্যত্র দেখা কোন উদ্ভিদের আবির্ভাব, প্রাধান্য ও বিলুপ্তি যাচাই করে দেখা যায়, তবে ভূবিজ্ঞানীর পক্ষে ওই একই ধরনের উদ্ভিদবিশিষ্ট অন্য কোন শিলাস্তরের সংগে পারস্পরিক সংযোগ সূত্রটিও বের করা সম্ভবপর হয়। ফসিল-উদ্ভিদ ভূবিজ্ঞানীকে সুপ্রাচীন যুগের আবহাওয়া ও ভূ-সংস্থানের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণও দিতে পারে। আজ যাকে জীবন্ত দেখা যাচ্ছে, তার প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা জানা থাকলে একই গোষ্ঠীভুক্ত ফসিলরূপী উদ্ভিদের জীবনকালে কতটা তাপ ও আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়েছিল, তাও মোটামুটি নির্ভুলভাবে স্থির করে নেওয়া যেতে পারে; ভূবিজ্ঞানী উভয় প্রজন্মের মধ্যে তুলনা করে তাই-ই করে থাকেন। ভূবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী উভয়েই আজ এটা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, কোন্ বিশেষ যুগে কোন্ বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটেছিল, বংশ বিস্তার হয়েছিল,

কোন্ বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা থেকে প্রাণ আহরণ করেছিল অথবা বিবর্তনের কোন্ পথ ধরে অতি সহজ গঠন তরু-ভ্রূণ আজ তার দৈহিক গঠনে পরিবর্তন নিয়ে এল, জটিল থেকে জটিলতর দৈহিক কাঠামোর অধিকারী হল, একমাত্র উদ্ভিদ ফসিলই এ-সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। উদ্ভিদের প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের সন্ধানও তারাই দিতে পারে। ফসিলে ফসিলে জীবনের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা পর্যালোচনা করে এবং ভূবিজ্ঞানের হিসাবে পৃথিবীর যে বয়স ধরা হয়েছে, তা' বিচার করে দেখা গিয়েছে সাড়ে 32 কোটি বছর পূর্বে 'সিলুরিয়ান' (Silurian Period) পর্ব শুরু হবার আগে পৃথিবীতে উদ্ভিদ-দেহের কোন কঠিন অবলম্বন বা হাড় ছিল না। মোটামুটি হিসাবে 31 কোটি 60 লক্ষ বছর আগে 'ডিভোনিয়ান পর্বে' (Devonian Period) ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ (Gymnosperm) ও পাখাহীন পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। 23 কোটি বছর আগেকার উর্ধ্বতর কারবন-উৎপাদী (Upper Carboniferous) শিলাস্তরে প্রথম ডানাওয়ালা পতঙ্গের অস্তিত্বের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমাদের চারদিকে আজ যে angiosperm বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদ সর্বদাই দেখতে পাচ্ছি, বিবর্তনের দিক থেকে তারা সবচেয়ে উন্নত এবং সেগুলিকে বলা যায় 'আধুনিক'। তাদের পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব ঘটে Cretaceous বা তৎপরবর্তী কোন যুগপর্বে। পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের আজ যে চেহারা দেখতে পাচ্ছি, তা' নিতে তারা শুরু করল এই পর্বে, 6-7 কোটি বছর আগে। আরও পুরাকালের যে-সকল উদ্ভিদ, Pteridosperm নামে যাদের পরিচিতি, তারা নিশ্চিহ্ন মুছে গিয়েছে আগেই, Jurassic যুগে। কারবন-উৎপাদী শিলাস্তরে Pteridosperm-দের যে সকল অবশেষ রয়েছে, ভূবিজ্ঞানের সবচেয়ে খাঁটি 'নির্দেশক' তারাই : কেননা, তাদের বিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুততালে। ভূবিজ্ঞানের কাল-নির্ঘন্টের (Geological Time Scale) অতি বিস্তীর্ণ পরিসরের একটি ক্ষুদ্র অংশ জুড়েই তাদের অস্তিত্ব বজায় ছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই (ভূবিজ্ঞানের কালানুপাতে) তারা নিশ্চিহ্নও হয়ে গেল। এই যুগপর্বের ফসিলগুলি কেন ভাল 'নির্দেশক' হয়ে উঠল, তার কারণ হচ্ছে এই যে, এ-সকল প্রজাতি অতি বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে প্রচুর জন্মেছে। সুদূর অতীতে একদা তাদের বাড়-বাড়ন্ত অবস্থাই তাদের পরিচয় স্পষ্টভাবে দিয়ে চলেছে। অতএব, অজানা যুগের শিলাস্তরে যদি এই 'নির্দেশক ফসিল' পাওয়া যায়, তবে ভূবিজ্ঞানের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সূত্র ধরে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং সে-সকল শিলার সংগে, যাদের বয়স আমরা জানি, তাদের সম্পর্কও নির্ণয় করতে পারি।

অধ্যাপক সাহনি ব্যাপারটি আরও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ 'শিলাস্তরে যে সকল ফসিলের অবশেষ রয়েছে, সেগুলি পরীক্ষা করে আমরা আরও নিশ্চিতভাবে একটি স্তরকে অন্য স্তর থেকে পৃথক করে নিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ কল্পনা করুন, কয়লাখনিতে একটি ছোট্ট ডোবার ধারে বসে আপনি আঙুর খাচ্ছেন এবং আঙুরের বীচিগুলি জলে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সেই ডোবার তলদেশে তখন খড়িমাটি বা chalk-এর স্তর গড়ে উঠছিল—পরবর্তীকালে সেই বিশেষ স্তরটি পরীক্ষা করে আমরা বলে দিতে পারব কোন্ বিশেষ দিনে আঙুরের বীচিগুলি সেখানে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। অথবা মনে করুন, ওই খনিতেই এক রাতে একটি আলোর চারপাশে এক ঝাঁক পতঙ্গ উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং সেই সময় কয়েকটি পতঙ্গ ওই ডোবায় পড়ে গেল, অথবা জলের তোড়ে ভেসে এসে কয়েকটি পতঙ্গ সেই ডোবার খড়িমাটির পলির নিচে চাপা পড়ে পাথর হয়ে গেল। এখন, বহুকাল পরে ওই পতঙ্গগুলির দেহাবশেষ পরীক্ষা করে আমরা নির্ভুল বলে দিতে পারি ওই স্তরটি কোন্ বিশেষ দিনে, এমন কি, কোন্ বিশেষ সময়ে গড়ে উঠেছিল।'

ছয়

প্রথম কর্মজীবন

কেম্ব্রিজে পড়াশোনা শেষ করে অধ্যাপক সাহনি 1919 সালে ভারতে ফিরে আসেন এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে এক বছর অধ্যাপনা করে তিনি লাহোর চলে যান। 1920–21 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ান। 1921 সালে' ডঃ সাহনি এলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক হ'য়ে। উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং পরবর্তীকালে ভূবিজ্ঞানের প্রধান হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকেন 1949 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।

উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখার দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই তিনি প্রাক্-স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যসূচী সংশোধন করে নেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানে অনার্স ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিজের যথেষ্ট কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি বি. এস. সি. ক্লাশে পড়াতেন, কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন পড়াশোনায় ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম-নিষ্ঠা আনতে হলে জুনিয়র ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যাপারটি সিনিয়র শিক্ষকদের হাতেই রাখা উচিত। ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাতে হ'লে এটি একটি অপরিহার্য শর্ত। যে বয়সে ছাত্ররা চিন্তার দিক থেকে সহজেই অভিভূত হয়, সে বয়সে তাঁদের শিক্ষাদানের ব্যাপারটি সিনিয়র অধ্যাপকদের হাতে থাকলে তারা চিন্তা ও মননের দিক থেকে নিয়মানুগামিতা ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবে। ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহই তাঁকে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। তিনি নিজেই ছাত্রদের ড্রয়িংগুলি পরীক্ষা করে দেখতেন এবং ধীর ও সুস্থচিত্তে কঠিন বিষয়গুলি ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। প্রতিভাবান পরিশ্রমী ছাত্ররা অযাচিতভাবেই তাঁর প্রশংসা পেত। পড়াশোনায় যাদের তেমন আগ্রহ ছিল না, তাদের তিনি মাঝে মাঝে সস্নেহ ভর্ৎসনা করতেন। ফলে, পড়াশোনার ব্যাপারে তারাও তৎপর হয়ে উঠত।

একবার কয়েকটি অপরিহার্য্য অবস্থায় পড়ে অধ্যাপক সাহনি প্রাক্-স্নাতক ক্লাশ নেওয়া বন্ধ করে দেন। ছাত্ররা তাঁর এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল এবং এ ব্যাপারে শ্রীমতী সাহনির দ্বারস্থ হয়ে অনুরোধ জানাল যে তিনি যেন তাদের হয়ে অধ্যাপকের সংগে কথা বলেন। যা' আশা করা গিয়েছিল, তাই ঘটল। অধ্যাপক সাহনি আবার প্রাক্-স্নাতক ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। যে আন্তর্জাতিক খ্যাতির তিনি অধিকারী হয়েছিলেন এবং তরুণ বয়সেই তাঁর ওপর যে সম্মানের ধারাবর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে তাঁর উদ্ধত ও অবিনয়ী হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু অধ্যাপক সাহনির ক্ষেত্রে তা' ঘটেনি। এত প্রশংসা, এত গুণগান সত্ত্বেও তাঁর মধুর স্বভাব, বিনয়নম্র আচরণ ও সদাশয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই প্রয়োজনে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য ছাত্ররা সবসময়েই তাঁর সামনে হাজির হতে পারত। এ সম্পর্কে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র শ্রী আর. এস. সি. পাল নিম্নোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন ঃ শ্রীপাল তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভর্তি হবার পর প্রথম ছুটির সময়ে

শ্রীপাল তাঁর নিজের শহরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাস্তায় নেমে দেখেন যানবাহন বলতে কিছুই চোখে পড়ছে না অথচ ট্রেনের সময় হয়ে আসছে। পাল ইউনিভার্সিটি রোড ধরে এগোতে থাকলেন এই আশায় যে, একটা কিছু যানবাহন জুটে যাবেই। ঠিক সে সময় একখানা গাড়ি পেছন থেকে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। গাড়ির ড্রাইভার পালের কাছে জানতে চাইলেন বারবার সে ঘাড় বেঁকিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে কেন, এবং তার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না। পাল তাঁর উদ্বেগের হেতু জানালে ড্রাইভার বললেন ঃ নিন, উঠে পড়ুন, আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিচ্ছি। ট্রেন ধরার জন্য গাড়ি ছুটে চলল স্টেশনের দিকে।

স্টেশনে পৌঁছে পাল বললেন ঃ আপনি আমাকে এতটা সাহায্য করলেন, কিন্তু আপনার পরিচয়টি তো জানা হ'ল না।

ড্রাইভারের চট্ জলদি জবাব ঃ আমার নাম বীরবল সাহনি। গাড়িখানা অতঃপর তীরবেগে গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে চলল, আর দেখা গেল না। পাল নিশ্চয়ই সাহনির নাম ও খ্যাতির কথা শুনেছেন, কিন্তু চাক্ষুষ দেখলেন এই প্রথম।

অধ্যাপক সাহনির বিজ্ঞান-চর্চার প্রথম দিকের আর এক কাহিনী তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সাহনির মুখে শোনা। 1923 সালের বিপর্যয়কর বন্যা। গোমতী নদীর জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ্ণৌ-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত। তাঁদের বাড়ি ছিল নদীর খুব কাছাকাছি এবং প্রচণ্ডভাবে ফেঁপে-ফুলে-ওঠা নদীর ভয়ঙ্কর রোষ থেকে এই বাড়িটিও রেহাই পায়নি। বন্যার জল এমন তোড়ে এসে বাড়িতে ঢুকল যে আসবাব ও অন্যান্য জিনিস রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠল। ভাগ্যক্রমে অধ্যাপক সাহনির আগেই খেয়াল হয়েছিল এবং সময় থাকতে তিনি তাঁর ফসিল-সংগ্রহ ও গবেষণাসংক্রান্ত সব কাগজপত্র অন্যত্র সরিয়ে রেখেছিলেন। সেই বিপদের দিনে শহরের অন্য আরও তিনটি পরিবার এই একই বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তীব্র স্থানাভাব ঃ তাই একটি ঘরে চারটি পরিবারের রান্নার ব্যবস্থা। মহিলারা পালা করে রান্নার তদারকী করছেন। একদিন দুপুরের রান্নার তদারকীর ভার পড়েছিল শ্রীমতী সাহনির ওপর। রান্নায় দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই অস্থায়ী হেঁসেলের উনুনে আগুন যেন জ্বলতে চাইছে না। শ্রীমতী সাহনি অধৈর্য্য হয়ে পাচককে বললেন ঃ বাপু হে, কাঠের টুকরোগুলি একটু নেড়েচেড়ে দিলেই তো আগুন ঠিক ঠিক জ্বলে উঠবে। পাচক গজগজ করে বলে উঠল ঃ এক ঘন্টা ধরে তো কাঠের গুঁড়িগুলি নাড়ছি, কিন্তু ওদের ধনুর্ভঙ্গ পণ, ওরা কিছুতেই জ্বলবে না। শ্রীমতী সাহনি ধৈর্য্য হারালেন, চিৎকার করে বললেন ঃ 'যাও, সরে যাও, আগুন জ্বালাতেও শেখনি দেখছি। দাও, আমিই জ্বালিয়ে দিচ্ছি।' কিন্তু, যে মুহূর্তে তিনি সেই 'কাঠ' নেড়ে দিতে গেলেন, তখনই বুঝতে পারলেন এ যে সেই ফসিল কাঠেরই একটি যেগুলি অধ্যাপক বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য অতি কষ্টে নিরাপদ স্থানে তুলে রেখেছেন এবং পাচক এটিকেই উনুন জ্বালাবার কাঠ মনে করে ভুলক্রমে উনুনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। Eocene যুগের দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledon) উদ্ভিদের এই ফসিলটি প্রায় ছয় কোটি বছর আগেকার দাক্ষিণাত্যের আন্তঃকৃষ্ণশিলাস্তরে (Deccan Inter-trappean Series) পাওয়া গিয়েছিল।

সহকর্মী ও ছাত্রদের কাছে জানা যায় অধ্যাপক সাহনি ক্লাশে তাঁর বক্তৃতায় প্রথমে বক্তব্য বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ছাত্রদের সামনে রাখতেন এবং অতঃপর সেসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে এগিয়ে যেতেন। লেকচারের সংগে থাকত অঙ্কন—ছবি এঁকে বক্তব্য বিষয়কে আরও বোধগম্য করে তোলা দ্রুত কথা বলার অভ্যাস ছিল তাঁর। যেমন

তাড়াতাড়ি কথা, তেমনই তাড়াতাড়ি চিত্রাঙ্কনের সহায়তায় মনের কথা প্রকাশ করা। একটুও বাদ না দিয়ে, ছাত্রদের প্রশ্ন বা কৌতূহলকে একটুও পাশ না কাটিয়ে চলত তাঁর অধ্যাপনা। ছাত্রদের পড়ানোর ব্যাপারে আর এক বৈশিষ্ট্যও সকলের নজরে পড়েছে। তিনি যে বিষয়টি পড়াচ্ছেন, সে বিষয়ে চর্চা কতদূর এগিয়েছে, বা সে বিষয়ে পরবর্তী আধুনিকতম গবেষণা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাও উল্লেখ করতে ভুলতেন না। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী লোকটি ক্লাশে পড়াবার কালে কোন 'নোট' সংগে নিয়ে আসতেন না, অন্যদের বক্তব্য তিনি নির্ভুলভাবেই উপস্থিত করতে পারতেন।

তাঁর সহকর্মী লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ এ. আর. রাও-এর মতে, 'শ্রোতারা যে শ্রেণীরই হোক না কেন, ডঃ সাহনি লেকচার দিতেন সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায়, নিজের বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, এগুলি ছিল তাঁর বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য। সঠিক বাচনভঙ্গী, ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল এবং শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর তাঁর বক্তৃতার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিত।'

সাহনির 'লেকচার-এর নাম এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে সারা ভারতের ছাত্ররা এখানে ছুটে আসত এবং তাঁর উদ্ভিদবিদ্যা ক্লাশে ভর্তি হতে চাইত। কিন্তু এটা হল তাঁর জীবনের একটি দিক। অন্য দিকটি হল কোন কোন সময় গবেষক সাহনি শিক্ষক সাহনিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর জীবনের প্রথম আকর্ষণ ছিল গবেষণায় এবং ছাত্রদের কাছেও তিনি গবেষণার প্রতি অদম্য নিষ্ঠাই আশা করতেন। নিজে কাজ করতে গিয়ে তিনি যে কঠোর শ্রম, নির্ভুলতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ওপর জোর দিতেন, ছাত্রদের কাছেও তিনি তাই আশা করে এসেছেন। তাঁর চরিত্রের এই গুণগত বৈশিষ্ট্য ছাত্রদের মধ্যেও দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভুল ও নিয়মসিদ্ধ কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। ডঃ রাও-এর মতে 'তাঁর গবেষণাপত্রের সংগে তিনি যেসকল চিত্র বা নকশা দিতেন সেগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে নিখুঁতভাবে রচিত হত।'

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল অবদানের কথা উল্লেখ করতে গেলে এটা বলাই যথেষ্ট নয় যে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন, বরং এটাই মনে রাখতে হবে যে তিনি এই দুইটি বিভাগকে দেশের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য করে তুলেছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও অল্পসময়ে বেশী কাজ পাবার জন্য একটি ফসিল কাটা যন্ত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি কেনার জন্য যুক্তপ্রদেশ (উত্তর প্রদেশ) গভর্ণমেন্টকে দিয়ে 4 হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়ে নিতে তাঁকে 1932 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এর আগে ফসিল কাটার জন্য তাঁকে নিজ হাতেই wire-bow ব্যবহার করতে হত।

যদিও অনেক বছর ধরেই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগটি ছিল, কিন্তু এর প্রধান আকর্ষণ ছিল Palaeobotany বা উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান। অধ্যাপক সাহনি দীর্ঘদিন ধরেই এটা অনুভব করেছিলেন, ভূবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় শিক্ষা না থাকলে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের চর্চাও দারুণভাবে ব্যাহত হয়, অথচ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগোত্রীয় অন্য এক বিজ্ঞান, অর্থাৎ ভূবিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।

একথা মনে রেখেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য বহু বছর চেষ্টা চালিয়ে আসেন এবং 1943 সালে এ ব্যাপারে সফল হন। নতুন বিভাগটি খোলা হলে তিনি এটির

প্রধান হন। স্নাতকোত্তর ছাত্ররা উদ্ভিদের Morphology (অংগসংস্থানবিদ্যা) নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা আরম্ভ করার আগে তিনি নিজেই ছাত্রদের ভূবিজ্ঞানের পদার্থ ও ভূস্তর-বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়গুলি পড়িয়ে দিতেন। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় এম. এস. সি. ছাত্রদের জন্য Palaeo-botany-র একটি 'স্পেশাল পেপার' প্রবর্তন করা হয়। যাঁরা এই 'পেপার' নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, কেবলমাত্র তাঁদেরই এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার উপযুক্ত গণ্য করা হ'ত।

অধ্যাপক সাহনি বিজ্ঞানের এক শাখার পদ্ধতিগত কলাকৌশল প্রয়োগ করে বিজ্ঞানেরই অন্য শাখার অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে প্রয়াসী ছিলেন। 1936 সালে *Current Science* সাময়িক-পত্রে তিনি লিখলেন ঃ 'এটা বিশেষজ্ঞতার যুগ। এই যুগে মানুষের চিন্তা অনিবার্য-ভাবেই সেই বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে। ফলে, বিজ্ঞানের এক শাখার সংগে অন্য শাখার সম্পর্কটি অনেকেরই চোখে পড়ে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চোখে পড়লেও সেটাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।'

এদিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে তাঁর পদ্ধতি ছিল অনন্য-সাধারণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফসিল উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে তিনি 'ভাসমান মহাদেশ তত্ত্ব'টি (Continental Drift Theory) যাচাই করে দেখেছেন অথবা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার কালে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষ পদ্ধতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রত্নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের সম্পর্কটি খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সাহনি একবার সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ শহর হরপ্পায় (খৃষ্টপূর্ব 2500 বছর) গিয়ে এক জাতের *conifer* বা মোচাকৃতি-শীর্ষবৃক্ষের কাঠ-কয়লা আবিষ্কার করলেন; বুঝতে পারলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই নগরের অধিবাসীদের সংগে পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল। ব্যবসায়িক সূত্রেই এসকল কাঠ নিশ্চয়ই পাহাড় অঞ্চল থেকে আমদানি করা হয়েছিল, কেননা, হরপ্পায় বা আশপাশের কোথাও *conifer* বৃক্ষ জন্মায় না।

অনুরূপভাবেই রোহতকের কাছে খোকরা খট ঢিবিতে তিনি কাদার মধ্যে এমন ধানের খোসার দাগ আবিষ্কার করেন যেগুলি দেখতে *Oryza sativa* শ্রেণীর *plena*-র মতো যাদের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শীষে একাধিক দানা রয়েছে। সেখানে প্রাপ্ত 'টেরাকোটায়' বা শক্ত মাটিতে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে তিনি তাদের কোষ ও পত্ররন্ধ্র বা Stomata বের করে নিয়ে আসেন। তাঁর মতে, এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই শ্রেণীর ধান প্রায় দু' হাজার বছর আগে যুধেয় উপজাতির লোকেরা জন্মিয়েছিলেন। রোহতকের কাছে পাওয়া কয়েকটি মুদ্রার ছাঁচ নিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণাও করেছিলেন, সেজন্যই রোহতক শহরের নামটির ব্যুৎপত্তিগত উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখতে পান যে 'রোহিতাক' নামে এক উদ্ভিদের নাম অনুসারেই রোহতক নাম রাখা হয়েছে (ল্যাটিন ঃ *Amoora Rohituka* W. & A; প্রতিশব্দ ঃ *Andersonia Rohituka* R.)। যেসকল উদ্ভিদের নামের উল্লেখ বইপত্রে রয়েছে, সেগুলির সঙ্গে যাচাই করে দেখেছেন যে এই উদ্ভিদ পাঞ্জাবে জন্মায় না এবং বাস্তবিক, অযোধ্যার পশ্চিমে, উত্তর ভারতের কোথাও দেখা যায় না। হতে পারে, ঐতিহাসিক যুগেই পাঞ্জাবে এগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। *Meliaceae* উদ্ভিদগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হ'ল এই *Amoora Rohituka*. এরা মাথায় পল্লবগুচ্ছের মুকুট পরা এক প্রকার চির সবুজ বৃক্ষ এবং এদের বাকল বা ছাল বেদনা-উপশমকারী ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শোনা যায়, অযোধ্যা, উত্তর-পূর্ব ভারত, পশ্চিমঘাট, শ্রীলঙ্কা ও মালয়সহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওরা এখনও জন্মে থাকে।

1936 সালে সাহনি হিমালয়ে কারেওয়া অঞ্চল থেকে এমন কতকগুলি ফলক সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন যেগুলি মানুষের হাতে তৈরী বলেই মনে হয়। এই নমুনার দ্বারা তিনি দেখিয়ে দিলেন ভারতে মানব-আবির্ভাবের পরে হিমালয়ের উত্থান ঘটেছে। বহু বিচিত্র বিষয়ে মানুষটির কৌতূহল তাঁর বহুমুখী কর্মশক্তির দিকেই ইঙ্গিত করছে। নিজেকে তিনি কেবলমাত্র ফসিল উদ্ভিদ নিয়েই ব্যস্ত রাখেননি ; সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়েও তিনি মন দিয়েছেন।

অধ্যাপক সাহনি ডিগ্রী পাবার চেয়ে 'গবেষণার জন্য গবেষণাকেই' অধিকতর গুরুত্ব দিতেন এবং 1932 সালের আগে পর্যন্ত ডক্টরেট থিসিসের জন্য তিনি তাঁর পরিচালনাধীনে কোন ছাত্রই নেননি। 1933 সালেই প্রথম একদল ছাত্র পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য তাঁর পরিচালনা-ধীনে নাম লেখায় এবং তারপর থেকেই এই যশস্বী বিজ্ঞানীর পরিচালনাধীনে কাজ করার জন্য ছাত্ররা অবিরাম স্রোতের মতো আসতে থাকল। 1933 থেকে 1949 সালের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে ষোলজন ছাত্র 'ডক্টরেট' পান।

যদিও নিজে ছিলেন 'প্যালিওবোটানিস্ট' তথাপি বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই গবেষণায় তিনি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। সহকর্মীর উৎসাহ পেয়েছিল বলেই Ecology বা পরিবেশবিজ্ঞান, Mycology বা ছত্রাকবিজ্ঞান এবং Bryology প্রভৃতি উদ্ভিদবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও গবেষণার উন্নতি ঘটেছিল। ছাত্রদের উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর পিতা রুচিরাম সাহনির নামে একটি গবেষণা-পুরস্কার প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞান বিভাগের 'ডিন' হিসাবে তিনি যে ভাতা পেতেন, তা' থেকেই এই পুরস্কারের অর্থ আসে। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের মধ্যে যাঁর গবেষণাপত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত, তাঁকেই এই পুরস্কার দেওয়া হত। 1933 সালে সর্বসম্মতিক্রমে 'ডিন' নির্বাচিত হয়ে 1949 সালে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর একই পদে অধিষ্ঠিত থাকা একটি দুর্লভ সম্মান। বীরবল সাহনি সেই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন।

সাত

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার গবেষণা

অধ্যাপক সাহনি 1936 সালের 24শে মার্চ, উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে 'একস্টেনশন' বক্তৃতা দেবার জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে রোহতক যান। সেখানে শহরের একেবারে গায়ে 'খোকরা কট'-এ কয়েকটি ঢিবির প্রতি বন্ধু ডঃ ভি. এস. পুরী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাহনি আবিষ্কার করলেন বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট গিরিখাতের ধসে-পড়া পারের বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যায় পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর ভাই ডঃ এম. আর. সাহনি বলেন ঃ '"ভূবিজ্ঞানীর হাতুড়ির ঘা" মেরে পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার লোকটির বহুমুখী কর্মশক্তিরই প্রতীক।' তিনি যে কাজেই হাত দিয়েছেন. সেটা সমাধা করেছেন নিষ্ঠার সংগে এবং অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। খোকরা কট-এর আবিষ্কার তারই প্রমাণ। ভারতে প্রাপ্ত এসকল মুদ্রার কেবলমাত্র ছাঁচগুলিই তিনি আবিষ্কার করেননি; মুদ্রা ঢালাইয়ের ব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান করেছেন এবং এ কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে, প্রাচীন চীনে এবং রোমান যুগের ইউরোপে ও উত্তর আফ্রিকার তৎকালীন মুদ্রা ঢালাইয়ের কলাকৌশলের সংগে ভারতীয় পদ্ধতির তুলনা করে দেখেছেন। যে বিপুল তথ্য তাঁর ভাঁড়ারে জমা হয়েছিল তা' থেকে এই কৌতূহলজনক সংবাদটি জানা যায় যে রোমান যুগের একশত বছরও আগে ভারত এমন জটিল ও বহু-উদ্দেশ্যমূলক ছাঁচ আবিষ্কার করেছিল যেগুলি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ইউরোপীয় ছাঁচের তুলনায় অনেক বেশী কর্মদক্ষ। মুদ্রাতত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর এই আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল *Journal of the Numismatic Society of India*র এক 'মনোগ্রাফ' বা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে, 1945 সালে। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'প্রাচীন ভারতে মুদ্রা ঢালাই পদ্ধতি'।

সংগ্রহ করে আনা হাজার হাজার 'টেরাকোটা' বা শক্ত পোড়ামাটির ছাঁচের মধ্যে তখনও কয়েকটি মুদ্রা ছিল। এই আকস্মিক আবিষ্কারের মূল্য যে কত বেশী অধ্যাপক সাহনি সেগুলি দেখামাত্রই বুঝতে পারলেন। ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বের ইতিহাসে এটাকে 'বরাত জোরের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অধ্যাপক সাহনি *Antiquities from the Khokra Kot Mound at Rohtak in the Jumna Valley* শিরোনামে এক 'মনোগ্রাফ'-এ এই আবিষ্কার বার্তা ঘোষণা করেন এবং *Current Science* সাময়িক-পত্রের 1936 সালের মে' মাসের সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। মুদ্রার ছাঁচগুলি নির্মাণের সময় হবে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। সাহনি সেগুলির প্লাস্টিকধর্মী ছাঁচের 'পজিটিভ' তৈরি করে নিয়ে সেসকল মুদ্রা-লেখের পাঠোদ্ধার করতে আহ্বান জানালেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডঃ কে. পি. জয়শোয়ালকে। দেখা গেল মুদ্রাগুলির ওপর লেখা রয়েছে 'বহুধানাকের যুধেয়দের মুদ্রা' (Yaudheyas(m) Bahudhanayaka)।

এ সম্পর্কে ডঃ ভি. এস. আগরওয়াল বলেছেন, 'যুধেয়দের মুদ্রার কথা আমরা শতবর্ষ আগে থেকেই জেনে এসেছি, তথাপি এই আমরা প্রথম তাদের তৈরি একটি টাঁকশালের সন্ধান গেলাম এবং সেটা রোহতক শহরের উপকণ্ঠে। কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান কথাটি হচ্ছে এই যে, বহুধানাকের অধীন যুধেয় রিপাব্লিকের নামটিও আমাদের জানা হয়ে গেল। মহাভারতের সভাপর্বে বহুধানাকের অন্তর্ভুক্ত যুধেয়দের নামের উল্লেখ রয়েছে। এই আবিষ্কার তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্বাস যোগ্যতার সুনিশ্চিত প্রমাণ দিয়ে গেল। মহাকাব্যটির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকার নির্ভরযোগ্যতাও সংগে সংগে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সারা ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা এটাকে একটি রোমাঞ্চকর আবিষ্কাররূপে অভিনন্দিত করলেন। 1936 সালের নভেম্বরে উদয়পুরে Numismatic Society of India-র যে অধিবেশন বসে সেখানেই সভাপতির ভাষণে প্রয়াত অধ্যাপক কে. পি. জয়শোয়াল ডঃ সাহনির এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের বার্তা ঘোষণা করেন।

প্রাচীন ভারতের মুদ্রা ঢালাই সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ডঃ সাহনি করেছিলেন বলেই তিনি দেখাতে পেরেছিলেন যে পাঞ্জাবের লুধিয়ানার কাছে সুনেত নামক স্থানে পাওয়া জিনিস-গুলির যে বর্ণনা 1884 সালে ডঃ এ. এফ. আর. হোয়ারনেল দিয়েছেন এবং যেগুলিকে কোন এক যুগের শীলমোহর বলে মনে করা হয়েছে, সেগুলি আসলে মুদ্রা ঢালাইয়ের ছাঁচ এবং এই ছাঁচেই পরবর্তীকালের কোন কোন যুধেয় মুদ্রা ঢালাই করা হয়েছে। এই 'ক্লু' ধরে এগিয়ে গিয়ে তিনি এমন কিছু পদার্থ হাতে পেয়ে গেলেন যা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল যে, রোহতকের বহুধানায়ক টাঁকশালটি যেমন প্রাচীন যুধেয় যোদ্ধা-জাতির হাতে তৈরি হয়েছিল, তেমনই সুনেত-এর টাঁকশালটি পরবর্তী কালের ওই একই গোষ্ঠীর মানুষের হাতেই গড়ে উঠেছিল।

অধ্যাপক সাহনির মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নী শ্রীমতী সাবিত্রী সাহনি মুদ্রার ছাঁচগুলি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হাতে তুলে দেন। সেগুলি এখন নয়া দিল্লির 'ন্যাশনাল মিউজিয়ম'-এ রয়েছে।

আট

খাজিয়ারের ভাসমান দ্বীপ

1910 সালে অধ্যাপক সাহনির যখন লাহোরে ছাত্রজীবন চলছে, তখন তিনি একবার পায়ে হেঁটে পাঠানকোট-খাজিয়ার-চম্বা-লেহ পর্যন্ত চলে যান এবং অবশেষে জোজি-লা গিরিসংকট-বালতাল-অমরনাথ-পহেলগাঁও হয়ে শেষে জম্মুতে ফিরে আসেন। তাঁর প্রথম যাত্রা বিরতিস্থল ছিল খাজিয়ার, পূর্বতন দেশীয় রাজ্য চম্বার একটি ছোট জায়গা, বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। খাজিয়ারে তিনি যে ডাকবাংলোতে আশ্রয় নিলেন, সেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 6400 ফুট উঁচুতে নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত হ্রদের ধারে একটি পশুচারণ ভূমিতে অবস্থিত। ডিম্বাকৃতি পশুচারণ ভূমিটি বনের ধার থেকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে হ্রদটিকে বেষ্টন করে জলাভূমির দিকে নেমে এসেছে। দীর্ঘ নলখাগড়ায় (উদ্ভিদবিজ্ঞানে যার নাম হল *Phragmites Communis*) পুরোপুরি ঢাকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ এই হ্রদের জলে পালতোলা নৌকোর মতো ভেসে বেড়ায়। এই হ্রদের গভীরতা কেউ জানেন না। কিন্তু স্থানীয় লোকদের মনে বিশ্বাস এর জল পবিত্র এবং মানুষের সাধ্য নেই এই জলের গভীরতা পরিমাপ করে। একমাত্র ভগবদ্-শক্তির প্রভাবেই দ্বীপটি হ্রদের জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্রদের পাশে একটি ছোট্ট মন্দির এবং সেখানে প্রতি বছর একটি ধর্মীয় মেলাও বসে।

অধ্যাপক সাহনি ডাক বাংলোর বারান্দায় বসে এই অদ্ভুত দ্বীপটির উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা লক্ষ্য করলেন, কিন্তু ব্যাপারটিকে তিনি এখানেই শেষ হতে দিলেন না। একনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর আগ্রহ ও কৌতূহল তাঁর মনকে নাড়া দিল। তিনি চিনতে পারলেন যে উদ্ভিদগোষ্ঠী ওই দ্বীপে বসতি করে নিয়েছে, সেগুলি *Phragmites* নলখাগড়া। কিন্তু মজার কথা হ'ল এই যে হ্রদের তীরে বা হ্রদের চারপাশে কয়েক মাইল জুড়ে এ ধরনের কোন উদ্ভিদের পাতা পাওয়া গেল না। তিনি 1910 সালে জানিয়েছেন যে পূর্বতন মণ্ডি স্টেটের (বর্তমানের হিমাচল প্রদেশ) রিওয়ালসার হ্রদে এমনই আরও কয়েকটি দ্বীপ একইভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছুদিন পরেই সাহনি আর একটি খবর পেলেন ব্রহ্মদেশ থেকে। সেখানে দক্ষিণ শান স্টেট-এর বিভিন্ন হ্রদে নাকি এ ধরনের খুদে দ্বীপ বেশ কয়েকটি রয়েছে এবং সেগুলিও হ্রদের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তিনি দেখলেন খাজিয়ার ও রিওয়ালসার অবস্থা একই ধরনের এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, খুব সম্ভব দুইটি স্বতন্ত্র দেশের দু'টি দ্বীপের উদ্ভব ঘটেছে একইভাবে।

খাজিয়ার এই ভাসমান জলাভূমি দ্বীপটিকে তিনি দানিয়ুব নদীর ব-দ্বীপ, ইস্ট অ্যাংলিয়ার ব্রডস্ এবং কাশ্মীরে এ ধরনের বিভিন্ন দ্বীপগুলির সংগে তুলনা করে দেখলেন। আবহাওয়া ও মৃত্তিকার বিশেষ অবস্থায় *Phragmites*-এর আবির্ভাব উদ্ভিদ অনুষঙ্গের ক্রমবিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় সূচিত করে : উন্মুক্ত জলাশয়ে ডুবে থাকা উদ্ভিদ—ভাসমান পর্ণ অনুষঙ্গ—নলখাগড়া-জলাভূমি অনুষঙ্গ—নলখাগড়া-দ্বীপ অনুষঙ্গ। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, 'খাজিয়ারের

যে জলাভূমিটি ভেসে বেড়াচ্ছে তা' অন্যত্র পরিলক্ষিত গাছ্-গাছড়ার ক্রমঃপর্যায় থেকেই গড়ে উঠেছে, হ্রদটির চতুর্দিকে একসময় একটি অতি-বিস্তীর্ণ নলখাগড়া-বিশিষ্ট জলাভূমি ছিল, যার একমাত্র প্রতীক হিসাবে টিকে রয়েছে এই খুদে দ্বীপটি এবং হ্রদটি এক সময় বর্তমানের তুলনায় অনেক বড় ছিল।' তাঁর মতে, গাছ্-গাছড়ার সমকেন্দ্রিক এলাকাগুলি ক্রমাগতই কেন্দ্রাভিমুখী হতে চাইছে এবং হ্রদটিকে আয়তনে ছোট করে দিয়ে চারদিকের চারণভূমির আয়তন বাড়াচ্ছে।'

নয়

বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব

অধ্যাপক বীরবল সাহনির বৈজ্ঞানিক অবদানের পরিমাণ এত বেশী যে এখানে তার তালিকা দেওয়া অসম্ভব। কেবলমাত্র কয়েকটি সুপরিজ্ঞাত কাজের কথাই এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর। উল্লেখ করা যাক *Nephrolepsis*, *Niphobolus*, *Taxus*, *Psilotum*, *Tmesipteris* ও *Acmopyle* প্রভৃতি জীবন্ত উদ্ভিদ নিয়ে তাঁর গবেষণার কথা। এ সকল গবেষণা উপরোক্ত উদ্ভিদগুলির বিবর্তনের প্রবণতা, তাদের ভৌগোলিক অবস্থিতি, গঠন এবং পারস্পরিক সাদৃশ্য বুঝে নিতে অনেকটা সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন Palaeobotanist বা 'উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানী' এবং সেজন্যই জীবন্ত উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় 1915 সালে *New Phytologist* নামক বিজ্ঞান সাময়িকপত্রে। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'On the Presence of Foreign Pollen in the Ovules of *Ginkgo biloba*, and its Significance in the Study of Fossil Plants'. এই আবিষ্কার সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, তা' থেকেই বিজ্ঞানী হিসাবে তরুণ বয়সে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় মেলে। তিনি লিখলেন, 'ফসিল অবস্থায় যদি অনুরূপ একটি উদাহরণ পাওয়া যায়, তবে খুব সম্ভবতঃ সেই প্রজাতির উদ্ভিদের পরাগরেণুও ডিম্বকের সংগে তার সম্পর্কের সন্ধান করতে হবে।' এ সম্পর্কে তিনি একথাও লিখলেন যে 'ডিম্বকের মধ্যে আটক ফসিল পরাগরেণুর পরিচয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার জন্য নিছক অঙ্কুরোদ্গমের ব্যাপারটিকেই আমল দেওয়া চলে না।' সিদ্ধান্তটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে মাত্র চার বছর আগে 1911 সালে, তিনি কেম্ব্রিজ গিয়েছিলেন এবং তখনও বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেননি। এই মন্তব্যটি থেকে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, তুলনামূলক বিচারবুদ্ধি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে, যেগুলি অনিবার্যভাবেই গবেষণায় সাফল্য লাভের জন্য তাঁর সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

তাঁর পরবর্তী গবেষণাপত্রটি ছিল *Nephrolepsis volubilis* নামক এক অদ্ভুত ধরনের ফার্ণ সম্পর্কে (the *New Phytologist*, 1915), যেগুলির অতিদীর্ঘ Stolon মূল গাছ থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে উঠে যায়। Stolon-গুলি সেই অতিকায় অরণ্যবৃক্ষকে বেষ্টন করে বাকল দিয়ে ঢেকে ফেলে, স্থানিক ব্যবধানে পার্শ্বগত উদ্ভিদ জন্মায় এবং অনেক সময়েই মূল গাছ থেকে আরও ওপরে ওঠে। অধ্যাপক সাহনি এই ফার্ণের Stolon-গুলির দৈহিক গঠন নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কিভাবে পার্শ্বগত উদ্ভিদের তলগত এক কেন্দ্রস্তম্ভ বহু কেন্দ্রস্তম্ভে পরিণত হয়, তার বিশদ বিবরণও প্রকাশ করেন। গবেষণার এ পর্যায় থেকে তিনি এবার এগিয়ে গেলেন *Nephrolepis cordifolia*র স্ফীতকন্দের সংবহন নালিকার গঠন নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে (the *New Phytologist*,

1916)। এসকল গবেষণাপত্র প্রকাশের অল্পদিন পরে তিনি Sudbury-Hardyman পুরস্কারের জন্য একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন—প্রবন্ধটির নাম ছিল 'Evolution of Branching in the Filicales'. তিনি লিখলেন 'পর্ণ বা পাতার সংগে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখার নির্দিষ্ট কোন অবস্থান নেই, কিন্তু যেখানে এই স্থানিক অবস্থান রয়েছে, সেখানে মূল বিবর্তনের বিচারে এটাকে একটি অপ্রধান বৈশিষ্ট্যরূপেই স্বীকার করে নিতে হবে ; সম্ভাব্য জৈবিক বিবর্তনের প্রয়োজনেই এটা এসেছে এবং এসেছে পুষ্পক উদ্ভিদের ফুলের কুঁড়িকে রক্ষা করার জন্যই। অবশ্য এটি ছাড়া অন্য কারণও থাকতে পারে।'

বীরবল সাহনি 1919 সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি ডিগ্রীর জন্য তাঁর 'থিসিস' দাখিল করলেন এবং গবেষণালব্ধ বিষয়গুলি পরের বছরে রয়েল সোসাইটির 'Philosophical Transactions' সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়। এই 'থিসিস'-এর জন্য তিনি New Caledonia-য় পাওয়া দুর্লভ ও স্বল্প পরিজ্ঞাত মোচাকৃতি বৃক্ষের (Conifer) অঙ্গ-সংস্থান ও দেহবিন্যাস নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা চালান। 1914 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার অধ্যাপক আর. এইচ. কম্পটন নমুনাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এই ফসিলগুলি প্রায় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল এবং শিলাস্তরে প্রকৃতি তেমন যত্ন করে এগুলি রক্ষাও করেনি। তরুণ গবেষকের কৃতিত্ব এই যে, এই বিরাট অন্তরায় সত্ত্বেও তিনি এই মোচাকৃতি গাছ *Acmopyle Pancherii* নিয়ে গবেষণা করে এগুলি সম্পর্কে তাঁর 'ডক্টরেট' ডিগ্রীর জন্য 'থিসিস' লিখেছিলেন।

এই 'থিসিস'-এ ডঃ সাহনি cordaitales-এর সংগে pteridosperms ও conifer-এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলেন। cordaitales বৃক্ষ যে pteridosperm গোষ্ঠী থেকে এসেছে, এই প্রচলিত ধারণা তিনি পুরোপুরি বাতিল করে দিলেন না যদিও, কিন্তু এই ধারণার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি যে রয়েছে, তা তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের জানিয়ে দিলেন। বৃক্ষের অঙ্গ-সংস্থানবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে তিনি gymnosperm বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে দুটি নতুন উপ-দলে ভাগ করতে চাইলেন : (১) *Phyllosperm,* যাদের বীজ পাতার ওপর জন্মায় ; (২) *Stachyosperm,* যাতে বীজ স্বাভাবিক বা পরিবর্তিত মেরুদণ্ডের ওপর স্থান করে নেয়। Phyllospermy ও Stachyospermy-র মধ্যে এই যে পার্থক্য টানা হল, তা' এখন সংবহন নালিকা-বিশিষ্ট সকল উদ্ভিদের রেণুস্থলীর অবস্থান সম্পর্কেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয়, অবশিষ্ট মোচাকৃতি বৃক্ষ থেকে তাদের যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা' বিবেচনা করে *Taxus, Torreya* ও *Cephalotaxus* প্রজাতিকে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত করার এবং সেগুলিকে Taxale বলে গ্রহণ করার যে প্রস্তাব সাহনি দিয়েছিলেন 1920 সালে, তা এখন Florin-ও মেনে নিয়েছেন (*the Botanical Gazette*, 1948)।

1919 সালে দেশে ফিরে এসেই ডঃ সাহনি ভারতে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানে (palaeobotany) কতটা কাজ হয়েছে এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বা কতদূর বিস্তৃত, তার একটা হিসাব-নিকাশ করতে বসলেন। 1922 সালে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশনের উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতিরূপে 'ভারতে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের অবস্থা' সম্পর্কে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : 'উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানে আমার যে আগ্রহ রয়েছে তা' থেকে আমার মনে এই আশাই জেগে উঠেছে যে, এই আকর্ষণীয় বিষয়টির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি ফেরাতে আমি হয়তো কিছুটা সাহায্য

করতে পারব এবং মৌলিক গবেষণার এই উর্বর-ক্ষেত্রে আরও অনেককেই নিয়ে আসতে পারব। এই কথাটি মনে রেখেই আমি ভারতে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের অবস্থা সম্পর্কে আমার ভাষণে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করতে চলেছি।'

যে ব্যাপারটি ডঃ সাহনি অনুভব করতে পেরেছিলেন, তা' হচ্ছে এই যে, উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের যে কোন চর্চা করতে হলেই পরীক্ষাধীন উদ্ভিদগুলি কোন্ ভৌগোলিক ও ভূবিজ্ঞানগত অবস্থার মধ্যে একদিন বেঁচে ছিল এবং তারপর একদিন মরেও গিয়েছে, সেটা অবশ্যই দেখতে হবে। ভূবিজ্ঞানের দিক থেকে পশ্চাতপট বা প্রাক্-ইতিহাসের যথাযথ জ্ঞান ও উপলব্ধি না থাকলে ফসিল-উদ্ভিদের পর্যালোচনা সকল গুরুত্ব হারিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যায়।

1924 সালে অধ্যাপক সাহনি ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মুখ্যতঃ তাঁর নিজের চেষ্টায় এবং এলাহাবাদের অধ্যাপক ডব্লিউ. ডাজন, লাহোরের ডঃ এস. আর. কশ্যপ এবং মাদ্রাজের ডঃ কে. রঙ্গচারী প্রমুখ উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের সহযোগিতা ও শ্রমে তিন বছর আগে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল 'The Ontogeny of Vascular Plants and the Theory of Recapitulation.'

1866 সালে হেকেল তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বটি উপস্থাপিত করে বলেন, 'জীব বা উদ্ভিদ তাদের নিজ নিজ বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার কালে তাদের বংশগত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির একটা ঝোঁক দেখা যায়।' এ সম্পর্কে ডঃ সাহনি তাঁর ভাষণে বললেন, 'জীব বা উদ্ভিদের প্রতিটি পর্যায়ের গঠন তাদের পূর্বতন ও বর্তমান অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন; বৃহত্তর অর্থে পূর্বপুরুষ থেকে সকল বৈশিষ্ট্য এবং সংকীর্ণ অর্থে, আশু পরিবেশ থেকে সে যা পাচ্ছে, এই দুইয়ের সমাবেশেই তাদের গঠন সম্ভবপর হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে যখন এই সাম্য অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়, তখন বিগত অভিজ্ঞতার অধিকতর নিশ্চিত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েই তাকে টিকে থাকতে হয়। তথাকথিত 'অস্বাভাবিকতা'র যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এর মধ্যেই পাওয়া যাবে (এটাকে প্রত্যক্ষগোচর দানবীয় ব্যাপার-স্যাপার থেকে আলাদা করে দেখতে হবে) এবং বুঝে নিতে হবে যে এসকল অস্বাভাবিকতা বিগতকালের স্মৃতির পথ ধরেই এসেছে। আজ যা' অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে দূর বা নিকট অতীতের পূর্বপুরুষদের জীবনে তাই স্বাভাবিক ও স্থায়ী দৈহিক গঠনের অঙ্গরূপেই একদিন ছিল।'

এই মতবাদ এ পর্যন্ত প্রাণিবিদ্যার দিক থেকে সমর্থন পেয়ে এসেছে এবং জীবজন্তুর ভ্রূণতত্ত্ব ও জীবাশ্মবিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যপুঞ্জ তার নির্ভুলতা দেখিয়েও দিয়েছে এবং সেটা এমন এক সময়ে, যখন বিবর্তনবাদও পুরোপুরি গৃহীত হয়নি, বরং সে তখনও আপন স্বীকৃতিলাভের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য, সকলেই আশা করে থেকেছেন যে জীবন-বিজ্ঞানের এ ধরনের একটি মৌলিক নীতি উদ্ভিদজগতেও সমভাবেই প্রযুজ্য হবে। অধ্যাপক সাহনি দেখিয়ে দেন, হেকেল তত্ত্বের প্রতি উদ্ভিদবিজ্ঞানেরও সমর্থন রয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের দিকে এই ঝোঁক একটি উল্লেখ্য ব্যাপার বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই গবেষণাপত্রে তিনি সুস্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিলেন, সংবহন নালিকা-বিশিষ্ট অপুষ্পক উদ্ভিদ, ব্যক্তবীজী বীজ ও গুপ্তবীজী ফুলের মধ্যে এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে, যা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে জীবন-বিজ্ঞানের সুপরিচিত তত্ত্ব 'Ontogeny tends to repeat phylogeny' ('সমষ্টিতে যার উদ্ভব, ব্যষ্টিতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটার একটা ঝোঁক থাকবেই') উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযুজ্য।

1929 সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সাহনিকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রী দেন। এই ডিগ্রীর জন্য তিনি যে প্রবন্ধ পেশ করেন, বা তারও আগে তিনি যেসকল গবেষণা করেন, সেগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবন্ত উদ্ভিদের সংগে ফসিল উদ্ভিদের তুলনা করে এসেছেন। সেসকল উদ্ভিদের অঙ্গ-বিন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা কোন্ গোত্রীয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি কাজে এগিয়েছেন। 'ডক্টর অব সায়েন্স'-এর জন্য তাঁর প্রবন্ধটির শিরোনাম 'The New Morphology' (H. Hamshaw Thomas, 1931).

অধ্যাপক সাহনির এই গবেষণার কাজটি সম্পর্কে স্টকহোমের রিক্স্ মিউজিয়মের অধ্যাপক টি. জি. হ্যাল বলেছেন ঃ 'বর্গ বা গোষ্ঠী অনুযায়ী উদ্ভিদের জন্ম বা সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ে তাঁর আলোচনা বিশ্লেষণ-ধর্মী চিন্তার ওপর অতি উজ্জ্বল আলোকপাত করেছে। শুধু তাই নয়, এই আলোচনা থেকে আরও দেখা যায় যে, তরুণ বয়সেই তিনি জীবন্ত ও ফসিল অবস্থায় pteridophytes ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের দৈহিক গঠন ও অঙ্গ-বিন্যাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানও অর্জন করেছেন। কেম্ব্রিজে কয়েক বছর কাটাবার কালে তিনি যে উঁচু দরের কাজ করেছেন, অতিশয় দুরূহ ও পরস্পর সম্পর্কহীন গবেষণার কাজগুলির মধ্যে তিনি এমনভাবে সময় ভাগ করে নিয়েছিলেন যে, চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়।'

কেম্ব্রিজের বোটানি স্কুলে অধ্যয়ন কালেই সাহনি বিশুদ্ধ উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—যদিও উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়ের ওপরেই তাঁর এই রচনা। তার মধ্যে প্রথমটি হল পুরাজীবীয় (palaeozoic) যুগের ফার্ণ বা পর্ণাঙ্গের দৈহিক গঠন ও অঙ্গ-সংস্থান এবং দ্বিতীয়টি হল ঃ ভারতের গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের ফসিল-উদ্ভিদ। ফসিল-উদ্ভিদ চর্চ্চায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁরই শিক্ষক অধ্যাপক (পরবর্তীকালে স্যার) এ. সি. সেওয়ার্ড এবং এই প্রেরণা তাঁর সারাজীবন স্থায়ী হয়েছিল। অধ্যাপক সাহনি প্রায়ই একথা স্বীকার করতেন এবং অধ্যাপক সেওয়ার্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। Cambridge School of Palaeobotanical Research-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক সেওয়ার্ড যেমন করে পরবর্তীকালে অধ্যাপক সাহনিও হয়ে উঠেছিলেন ভারতে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান চর্চ্চার প্রথম প্রবর্তক।

পুরাজীবীয় যুগের ফার্ণ-এর দৈহিক গঠন ও অঙ্গবিন্যাস

অধ্যাপক সাহনি পুরাজীবীয় (Palaeozoic) যুগের 'ফার্ণ' বা পর্ণাঙ্গ-সদৃশ উদ্ভিদ Coenopteridineae, বিশেষ করে, যারা Zygopteridaceae গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাদের নিয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। এ ধরনের উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। যদিও গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে অত্যধিক আকর্ষণীয়, কিন্তু গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে সেসবে অভূতপূর্ব সমস্যাও রয়েছে। যদিও শিলাস্তরে ফসিলগুলি সুরক্ষিতই ছিল, কিন্তু সেগুলি এমন ছোট ছোট টুকরোতে ভাগ হয়ে গিয়েছে যে সেগুলিকে জোড়া লাগানো প্রায় অসম্ভব। ফসিল-উদ্ভিদগুলিকে পাওয়া গেল শিলীভূত কাণ্ডরূপে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্রবৃন্ত ও পত্রশিরারূপেই তারা শিলাস্তরে রয়েছে। কদাচিৎ পাতার পাতলা স্তর ও রেণুস্থলীর

সন্ধান মেলে। এ ধরনের উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে হলে বাধ্য হয়েই তুলনামূলক পর্যালোচনার দিকেই এগোতে হবে। কিন্তু, এ ধরনের ভগ্নাংশ দিয়ে উদ্ভিদটির স্বভাব-চরিত্র বিচার করা অতিমাত্রায় কঠিন, তথাপি তুলনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ডঃ সাহনি অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমনকি, palaeobotanist বা উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মজীবন শুরুর প্রথমেই তিনি অধ্যাপক সেওয়ার্ডের অধীনে জীবন্ত ফার্ণ-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন, কেননা, ফসিল-উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার আগে এটার অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। Zygopteridean উদ্ভিদের কাণ্ড সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ও অব্যাহত গবেষণার ফলস্বরূপ বহু বৎসর জুড়ে বহু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল (1919a, 1928d, 1930a, 1932c).

এই কাণ্ডের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এমনই যে এখানে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে একই ফসিল নমুনাকে বিভিন্ন বর্গনাম (generic names) যথা, *Zygopteris*, *Ankyropteris*, *Clepsydropsis* এবং *Austroclepsis* দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হ্যালি বলছেন ঃ 'বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এবং ফসিল-উদ্ভিদটির বিভিন্ন ভগ্নাংশ জোড়া লাগিয়ে সাহনি এর কাণ্ডটির গঠন সম্পর্কে এক অপ্রত্যাশিত জটিল বিবরণ দিতে পেরেছেন, তাদের অত্যাশ্চর্য আচরণের একটি চিত্রও আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। সাহনি দেখিয়েছেন উদ্ভিদটি আসলে ছিল একটি বৃক্ষাকৃতি ফার্ণ, এর দেহকাণ্ডের সংগে অন্য কোন দেহকাণ্ডের তুলনা চলে না। এর অস্থানিক মূলগুলিতে অসংখ্য সরু অথচ দ্বিখণ্ডিত কাণ্ডগুলি এমনভাবে প্রোথিত রয়েছে যে সেগুলিকে 'মেকি' বলেই মনে হবে, দেখলে মনে হবে যেন Cretaceous যুগের উদ্ভিদ প্রজাতি *Tempskya*-কেই দেখছি।'

পরবর্তীকালে অধ্যাপক সাহনি অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা এই নতুন বর্গের উদ্ভিদের নাম দিলেন *Austroclepsis*. এই উদ্ভিদ সম্পর্কে সাহনির পরবর্তী গবেষণা অন্য আর এক উদ্ভিদ-প্রজাতি সম্পর্কিত গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই নতুন গোষ্ঠীর নাম দিলেন তিনি *Asterochlaenopsis* (1930a). বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে এই উদ্ভিদ-প্রজাতির। সাইবেরিয়া থেকে সংগৃহীত একটি চমৎকার শিলীভূত কাণ্ড দীর্ঘকাল আগেই আড়াআড়িভাবে কেটে নেওয়া হয় এবং সেই কাটা অংশগুলি জার্মানীর যাদুঘরে স্থান পেয়ে যায়। টুকরোগুলি খুঁজতে গিয়ে সাহনি দেখতে পান টুকরোগুলি যে একই বৃক্ষের, তা বোঝার উপায় নেই ; এমনকি দুটি খণ্ডকে দুই বর্গের উদ্ভিদ বলেও বর্ণনা করা হচ্ছে এবং নামকরণ করা হয়েছে, যথাক্রমে, *Asterochlaena* ও *Rhacopteris* নামে। এই দুইটি খণ্ডকে পুনরাবিষ্কার করে এবং সেগুলিকে জোড়া লাগিয়ে সাহনি প্রমাণ করতে পারলেন তারা একই ফসিল নমুনার অংশ। অন্য আরও তিনটি টুকরো জুড়ে নিয়ে তিনি যে বৃক্ষকাণ্ডটি গড়ে তুললেন তাতে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমন্বয় প্রকাশ পেল। দেখা গেল, বৃন্তগুলি *Clepsydropsis* ধরনের, কিন্তু পত্রশিরাগুলি দেখতে *Asterochlaena*-এর মতো, এবং পূর্বে অজ্ঞাত ছিল এমন এক ধরনের কেন্দ্রস্তম্ভ নিয়ে ফসিল-উদ্ভিদটি এমন এক ধরনের হবে যা' *Asterochlaena* ও *Ankyropteris*-এর মাঝামাঝি একটা কিছু।

এসকল উদ্ভিদ সম্পর্কে ডঃ সাহনির প্রথম প্রবন্ধে Zygopteridean পাতার শাখাবিন্যাস সম্পর্কে সযত্ন বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা রয়েছে। এই গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এর মিশ্র পাতাগুলির শাখাবিন্যাস পদ্ধতি এমন যে, সাধারণতঃ অন্যত্র তেমনটি দেখা যায় না।

Zygopterideanগোষ্ঠীভুক্ত অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পক্ষলগুলি দুই দিকে দুইটি করে মোট চারটি সারিতে থাকে এবং মূল মেরুদণ্ডটির উপরেই সমকোণে তাদের অবস্থান, কিন্তু এই বিশেষ ধরনের পর্ণে কাণ্ড ও পাতার বৈশিষ্ট্যগুলির সংযোজন ঘটেছে।

উদ্ভিদ-বিদ্যায় যাঁদের আগ্রহ নেই বা জ্ঞানও নেই, তাঁদের কাছে এটা তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু *Clepsydropsis*-এর প্রকৃতি ও সাদৃশ্য নিয়ে এতদিন যে কুজ্ঝটিকা ছিল ডঃ সাহনি তার অনেকটাই দূর করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে Coenopteridineae নিয়ে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সাহনির এই বিশ্লেষণ অনেকটা সাহায্য করেছিল এবং এদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত মনে করে নিয়ে একটি সমগ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অনেকেরই শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতির মূলে নাড়া দিয়েছিল।

1929 সালে ইউরোপ ভ্রমণকালে ডঃ সাহনি *Zygopteris primara* (Cotta) Corda নামক এক অজানা উদ্ভিদ বর্গের ফসিল নমুনা সংগ্রহ করেন। অনেকগুলি প্রজাতি নিয়ে *Zygopteris* বর্গ গঠিত হলেও তার মধ্যে একটি ছাড়া অন্য সব কয়েকটিকেই পরে অন্য বর্গের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। জার্মানীর চেমনিৎস নামক স্থানে পারমিয়ান যুগ-পর্বের শিলাস্তরে সিলিকায় পরিবর্তিত ফার্ণের যে বৃন্ত নমুনা হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল, তারই গঠন-বিন্যাসের সূত্র ধরে ঐ ফার্ণকে *Zygopteris* প্রজাতিভুক্ত করা হয়েছিল। সে সময়ে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ওটাই ঐ উদ্ভিদবর্গের একমাত্র নমুনা, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও ঐ শ্রেণীর উদ্ভিদের ফসিল নমুনা নেই। কিন্তু, আসলে এই একই নমুনার করাত-কাটা অংশ পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে ছড়িয়েছিল। সাহনি বিভিন্ন দেশে গেলেন এবং ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর আধ ডজন মিউজিয়মে প্রস্তরীভূত উদ্ভিদবৃন্তগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, সেগুলি একই নমুনার অন্তর্ভুক্ত। বার্লিনে সাহনি আর একটি নমুনা দেখতে পান যেটা বৃন্তের পূর্ববর্তী অবস্থার একটি কাণ্ড বলেই মনে হয়। তিনি এক্ষেত্রেও উদ্ভিদটির বিভিন্ন ভগ্নাংশ জুড়ে নিয়ে একটি পরিপূর্ণ ফসিল-উদ্ভিদ গড়ে তুললেন এবং দেখতে পেলেন যে, এটি একটি ফার্ণ জাতীয় গাছ, যার রয়েছে ক্ষীণ মেরুদণ্ড এবং সেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিপুল সংখ্যক বৃন্ত ও অস্থানিক শেকড়ের ওপর। এর শারীর স্থান, দেহকাণ্ড, পাতার ছাপগুলির পর্যায়ক্রম এবং মূল পরীক্ষা করে দেখা গেল, এটা এমন এক শ্রেণীর উদ্ভিদ যাকে পূর্বে *Botrychioxylon*রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এদিকে বৃন্তের গঠনের বিচার করে যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ছে তাতে এটাকে *Etapteris*রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। অতএব দেখা গেল একটিমাত্র ফসিল নমুনায় তিন বর্গের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ ঘটেছে। অনুরূপভাবেই *Grammatopteris Baldaufi* (1932g) নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সেগুলিকে তিনি 1915 সালে জার্মানীর চেমনিৎস অঞ্চলে আবিষ্কৃত পারমিয়ান যুগের শেষের দিকের একটি প্রস্তরীভূত কাণ্ডের বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সংগে তুলনা করে দেখলেন। এই কাণ্ডের কাঠামো পরীক্ষা করে এবং সাদৃশ্যগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, *Grammopteris* কে Botryopteridaceae শ্রেণী থেকে সরিয়ে নিয়ে Zygopteridaceae শ্রেণীভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ সাহনি সর্বদাই সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলতেন। সে জন্যই ফসিলের নমুনা সংগ্রহ করতে এবং সেগুলির ইতিহাস জানতে তাঁকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যাদুঘরে যেতে হয়েছে। পুরোনো নমুনা সংগ্রহ এবং সেগুলি ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল দাঁড়িয়েছিল এই

যে, তিনি বিভিন্ন নমুনাকে একই বর্গ ও প্রজাতির মধ্যে স্থান করে দিতে পেরেছেন এমনভাবে দেখলে যেন মনে হয় তিনি গোলক-ধাঁধায় আটক পড়ার অবস্থা থেকে অবলীলাক্রমে বের হয়ে এসেছেন।

গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড

ভারতীয় উপদ্বীপ—যেখানে বিজ্ঞানীদের জানা অধিকাংশ ফসিল-উদ্ভিদই আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে, পৃথিবীর প্রাচীনতম স্থলভাগের অন্যতম হল সেগুলি। মধ্যজীবীয় যুগে (Mesozoic era) দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শুরু করে আফ্রিকা হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক অতি বিরাট মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারতবর্ষ। কথাটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, বর্তমানের দক্ষিণ অতলান্তিক ও ভারত মহাসাগর জুড়ে ছিল এই বিরাট মহাদেশটি। ভূবিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পিত দক্ষিণ মহাদেশের নাম দিয়েছেন 'গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড' (Gondwanaland). এর উত্তর দিক জুড়ে ছিল এক অতি বিস্তীর্ণ মহাসাগর যা' বর্তমানের উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়া নিয়ে গঠিত উত্তরের অতিবিস্তীর্ণ মহাদেশকে দক্ষিণের অতিবিস্তীর্ণ মহাদেশ থেকে পৃথক করে রেখেছিল। ভূবিজ্ঞানের কালনির্ঘন্টের হিসাবে যেটা তৃতীয় পর্যায় (Tertiary Era) সে সময় ভূমিস্তরে ও শিলাস্তরে এমন এক প্রচণ্ড আলোড়ন-বিস্ফোরণ হয় যে, গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এর বৃহত্তর অংশই চলে গেল মহাসমুদ্রের গর্ভে। বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে রইল বর্তমানের উপদ্বীপ দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত ও মালয়। আর রইল দ্বীপ-মহাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে অস্ট্রেলেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ।

Carboniferous বা অঙ্গার-উৎপাদী যুগের শেষ দিকে দক্ষিণ গোলার্ধ জুড়ে এমন পুরো তুষার-স্তূপ জমে যায় যে, পূর্বতন যুগের অধিকাংশ গাছপালাই মরে যায়। ইউরোপের অঙ্গার-উৎপাদী যুগের প্রথম অধ্যায়ের শিলাস্তর বিন্যাসের সংগে তুলনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার মত বহু দূরে দূরে অবস্থিত দেশগুলিতেও শিলাস্তরের নিচেকার তুষারজাত পলিস্তরের মধ্যে এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। ফসিল থেকে পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ নিশ্চিতভাবেই জানিয়ে দিচ্ছে, এই অতি বিস্তীর্ণ স্থলখণ্ডের জলবায়ু শীতল হলেও মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণই ছিল। অনুমান করা হয় যে, পরবর্তী পর্যায়ে জলবায়ু যথেষ্ট উষ্ণ হয়ে উঠেছিল যার ফলে বিচিত্র তরুলতার বিপুল উদ্ভব ঘটে পুরু কয়লার স্তর গড়ে ওঠা সম্ভবপর করে দিয়েছিল। ভূবিজ্ঞানের বিচারে এমন পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, যেগুলি বিচার করে বলা যায় পৃথিবীর ইতিহাসের এই অধ্যায়ে এক বিরাট মধ্য-ভূসাগর—যার নাম দেওয়া হয়েছে 'টেথিস' (Tethys)—উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই মহা-মহাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই দক্ষিণী মহা-মহাদেশের এক অখণ্ড অংশ ছিল ভারত এবং এর উত্তর উপকূল বর্তমানের হিমালয় পর্বতমালার পার্শ্ব দিয়েই মোটামুটি চলে গিয়েছিল। ভূবিজ্ঞানের তথ্যাবলী এবং উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের নানা ঘটনা এ বিশ্বাসকেই বদ্ধমূল করে তোলে যে, Carboniferous বা অঙ্গার-উৎপাদী যুগের আদি অধ্যায়ে—এবং কিছুতেই পারমিয়ান যুগের অন্ত্য-অধ্যায়ের পরে নয়—ভারত তুষারে ঢাকা ছিল। এমনকি, অধ্যাপক সেওয়ার্ড, যিনি ফসিল-উদ্ভিদের ব্যাপারে আবহাওয়ার মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করার বিষয়ে

অত্যন্ত সতর্কভাবে এগোতেই অভ্যস্ত ছিলেন, তিনিও মেনে নিয়েছেন পারমিয়ান যুগের অনেকটা পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের আবহাওয়া ছিল নিঃসন্দেহে শীতল এবং উত্তরের মহা-মহাদেশের চেয়ে গণ্ডোয়ানা ছিল অনেক কম আকর্ষণীয়।

ভারতের, বিশেষ করে ভারতের গণ্ডোয়ানা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ফসিল-উদ্ভিদ সম্পর্কে অধ্যাপক সাহনির আগ্রহ দেখা গিয়েছে কেম্ব্রিজে তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই। 'Geological Survey of India' বা 'ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা' যেসকল ফসিল-উদ্ভিদের নমুনা কেম্ব্রিজে পাঠাতেন, অধ্যাপক সাহনি এবং অধ্যাপক সেওয়ার্ড একযোগে সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এসকল গবেষণার ফলাফল তাঁদের যুগ্ম প্রকাশনা 'Indian Gondwana Plants, a Revision, 1920b'-এ প্রকাশিত হয়। উদ্ভিদের দেহ-সংগঠন ও অঙ্গবিন্যাস সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে নতুন তথ্য হাতে এসেছে, আংশিকভাবে তারই ভিত্তিতে এবং গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরের উর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশে প্রাপ্ত ফসিল-উদ্ভিদের বহিস্ত্বকের (Cuticle) গঠন পর্যালোচনা করে যা' কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর বলে মনে হয়েছে, তারই পুনরীক্ষা তাঁদের দুইজনের যুগ্ম-প্রকাশনার বিষয়বস্তু ছিল। গণ্ডোয়ানার নিম্ন শিলাস্তরে পাওয়া পুরাজীবীয় যুগের (Palaeozoic) ফসিল-উদ্ভিদ পরীক্ষা করে উত্তর ও দক্ষিণের উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেল। মোচাকৃতি শীর্ষবিশিষ্ট উদ্ভিদ *Torreya*-র —যার বর্গনাম হচ্ছে *Torreyites* —আবিষ্কৃত হবার পরে বোঝা গেল উত্তর মহা-মহাদেশের সুপরিচিত Taxale গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদরা Jurassic যুগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডে বংশ বিস্তার করেছিল।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশন 'Revision of Indian Fossil Plants'-এ সাহনি পুরাজীবীয় যুগের মোচাকৃতি শীর্ষবিশিষ্ট উদ্ভিদকেই বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। এটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়—Incrustations and Impressions (1928c) এবং Petrifactions (1931c). অধিকাংশ ফসিল আনা হয়েছিল গণ্ডোয়ানা স্তর-সমষ্টি থেকে এবং কিছু আনা হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবর্ণ আগ্নেয় শিলাস্তরের নিচ থেকে। এগুলিকে এখন সাধারণভাবে Eocene যুগপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফসিল-উদ্ভিদের পুনরীক্ষণ ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত এই দুই পুস্তকে রয়েছে ফসিলের বর্ণনা, চিত্র এবং ছিটানো-ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া অনেক প্রত্ন-পদার্থের বিশদ বিবরণ। সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে এবং করা হয়েছে কালানুপাতে শ্রেণীবিন্যাস। ভূস্তর-বিন্যাসে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে কোথায় কার অবস্থান, তাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যাপক সাহনির রচিত 'Revision of the Fossil Flora' প্রকাশের একটি মূল্যবান ফল এই যে, ইউরোপে প্রাপ্ত মোচাকৃতি শীর্ষবিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং ভারতের ঐ শ্রেণীর উদ্ভিদের পার্থক্য যেমন ধরা পড়েছে তেমন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ফসিল-উদ্ভিদের মধ্যে বৈষম্যও জানা গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তর ভারতের Pinaceae, Cupressaceae গোষ্ঠী বা Taxodiaceae বর্গের উদ্ভিদের চিহ্নমাত্রেরও সন্ধান উপদ্বীপ ভারতের কোথাও পাওয়া যায়নি।

যেসকল দেশ নিয়ে প্রকল্পিত গণ্ডোয়ানা মহাদেশ একদা গড়ে উঠেছিল বলে মনে করা হয়, অধ্যাপক সাহনি সেসকল দেশের ফসিল-উদ্ভিদ নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন এবং যেসকল ফসিল-উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের সাক্ষ্যপ্রমাণ ওয়েগনার-এর 'ভাসমান মহাদেশ তত্ত্ব'কে কতোটা সমর্থন করছে, তা' খুঁজে দেখার জন্যই তিনি এই কাজে প্রয়াসী হন।

ভাসমান মহাদেশ তত্ত্ব

যেসকল বিজ্ঞানীরা মনে করতেন পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ এক অখণ্ড স্থলসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরবর্তীকালে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে ওয়েগনার ছিলেন একজন। প্রকল্পিত এই অখণ্ড স্থলসত্তার নাম দেওয়া হয়েছিল Pangea। এই তত্ত্বের সপক্ষে একটি জোরদার প্রমাণও পাওয়া গেল এবং সেইই হচ্ছে, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দেহরেখার সাদৃশ্য। এক বৃহৎ সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুই দেশের উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর মধ্যে দেহগত এমন সাদৃশ্য রয়েছে যে, মনে হয় কোন এক যুগে তারা এক অখণ্ড স্থলসত্তায় জন্মেছে এবং বড় হয়েছে। পরবর্তীকালে এই স্থলসত্তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেলে প্রাণিকুল ও উদ্ভিদকুল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্ত্য-পুরাজীবীয় যুগের (Late Palaeozoic Era) ফসিল-উদ্ভিদ যেভাবে সমাবিষ্ট রয়েছে, তা থেকে এটাই দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয় যে, এসকল মহাদেশ কোন একসময়ে একটি অখণ্ড সত্তারূপেই বিরাজ করেছিল।

1935 সালে সাহনি এক প্রবন্ধে লিখলেন, বিস্তীর্ণ মহাসমদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলি প্রচণ্ড এক প্রবাহের চাপে বর্তমানের পাশাপাশি অবস্থানে এসেছে—এই তাত্ত্বিক উক্তির সংগে তিনিও একমত। ভারতে *Glossopteris* বর্গের উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল সম্ভবতঃ Upper Carboniferous থেকে Triassic যুগ পর্ব পর্যন্ত। তালচের-এর হিমবাহজনিত স্তরের তলদেশ এবং উদ্ভিদ-উৎপাদী প্রাচীনতর গণ্ডোয়ানা স্তর, তাদের বয়স নির্ধারণ-উপযোগী ফসিল-স্তর, এই উভয়ের সম্পর্কের শেষ সীমা পাওয়া যাচ্ছে ভারতে, বিশেষ করে কাশ্মীরে ও লাবণিক পর্বতশ্রেণীতে (Salt Range).

উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানে অধ্যাপক সাহনির মূল্যবান অবদানগুলির মধ্যে রয়েছে *Glossopteris* সম্পর্কে বিশদ বিবরণ। এ ধরনের উদ্ভিদের পাতা সম্পর্কে প্রায় এক শতাব্দী আগেই জানা ছিল এবং এগুলিকে 'ফার্ণ'-পাতা বলেই গণ্য করা হত। কিন্তু সাহনির গবেষণায় দেখা গেল এসকল উদ্ভিদের পাতা থাকলেও সেগুলিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একমাত্র বীজ-উৎপাদী উদ্ভিদের পাতায় থাকতে পারে। *Glossopteris* উদ্ভিদের সংগে সমসাময়িককালের উত্তরাঞ্চলীয় উদ্ভিদ এবং তুষার যুগের গণ্ডোয়ানা উদ্ভিদের সম্পর্ক নিয়ে যে নানা প্রশ্ন রয়েছে, সেগুলি নিয়ে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ভারতের ফসিল-উদ্ভিদ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের শিলাস্তরে প্রোথিত ফসিল-উদ্ভিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং ভৌগোলিক ও ভূবিজ্ঞানের বিচারে এই সম্পর্কের তাৎপর্য কী, এ নিয়ে তিনি বিস্তর গবেষণা করেছেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ একথাই বলছে, নানা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ *Glossopteris* শীতল নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশেই জন্মাতে পারে। সে জন্যই ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ মেরু মহাদেশে এদের প্রাচুর্যের ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয়। সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে উঠল যখন অধ্যাপক Halle চীনে এক অতিকায় উদ্ভিদ *Gigantopteris* আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কার থেকে জানা গেল যে, উদ্ভিদটি আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিল এবং এই একই শ্রেণীর উদ্ভিদ দক্ষিণ অভিমুখে মধ্য-সুমাত্রা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

এর অব্যবহিত পরেই অধ্যাপক Zalessky আবিষ্কার করলেন আঙ্গারাল্যাণ্ড উদ্ভিদ তার উত্তরের আদি বাসস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে কাশ্মীরের কয়েক শত মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছিল, যেটা নাকি ছিল *Glossopteris*-এর উত্তর সীমানা। ডঃ সাহনির মতে

এ সকল ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মিলতে পারে যদি 'ভাসমান মহাদেশীয় তত্ত্ব' মেনে নেওয়া হয়। তাঁর চিন্তায় এটাও ধরা পড়ল ভারতীয় উপদ্বীপ এক সময় সুপ্রাচীন মহা-মহাদেশ Pangea-রই অংগীভূত ছিল এবং ক্রমাগত ভাসতে ভাসতে মূল এশীয় মহাদেশের নিকট সান্নিধ্যে এসে যায়।

অধ্যাপক সাহনি বললেন : যদি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভিদ *Glossopteris* চীন-সুমাত্রা অঞ্চলের আবহাওয়া থেকে স্বতন্ত্র কোন আবহাওয়ায় জন্মে থাকে, বড় হয়ে থাকে, তবে এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় নেই যে, আদিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া এবং চীন-সুমাত্রা পরস্পর থেকে অনেক দূরে Tethys সাগরের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে ছিল এবং পরে ক্রমশঃ তারা একে অন্যের দিকে ভেসে চলে যায়। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, এক প্রচণ্ড শক্তির অভিঘাতের ফলে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলি ভাসতে ভাসতে একে অন্যের পাশাপাশি চলে এসেছে। তিনি আরও বললেন, উত্তর-পূর্ব আসামের পর্বতশ্রেণীতে একটি সুস্পষ্ট কোণ সৃষ্টি করে হিমালয়ের মেরুদণ্ড দক্ষিণ দিকে বেঁকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। কোন কোন ভূবিজ্ঞানীর অভিমত যদি সত্য হয়, অর্থাৎ হিমালয় এখনও আরও উঁচু হয়ে চলছে বলে যদি মেনে নিতে হয়, তবে এটাও মেনে নিতে হবে যে, উত্তর ও দক্ষিণের স্থলখণ্ড এখনও পরস্পরের ওপর চাপ দিয়ে চলেছে। হিমালয়ের মেরুদণ্ডে যে হাঁটুর মত বাঁকানো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং কাশ্মীর ও আসামকে কেন্দ্র করে সেই মেরুদণ্ড আবর্তিত হচ্ছে, একথা যদি সত্য হয়, তবে ক্রমান্বয়ে কয়েক বছর ধরে ভূ-দ্রাঘিমার নির্ভুল পরিমাপ লিপিবদ্ধ করলে দেখা যাবে যে, বেলুচিস্তান ও শান মালভূমির দু'টি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব এখনও হ্রাস পেয়ে চলছে।

ডঃ সাহনির আর একটি সিদ্ধান্ত : যদিও সামগ্রিকভাবে একদিকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার *Glossopteris* উদ্ভিদ এবং অন্যদিকে চীন-সুমাত্রার *Gigantopteris* উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট, কিন্তু মনে হচ্ছে যে, Permo-Triassic যুগে Tethys সমুদ্র অতিক্রম করে ভারত ও দূরপ্রাচ্য এবং গণ্ডোয়ানা ও আঙ্গোরা মহাদেশের মধ্যে কিছুটা আদান-প্রদান ঘটেছিল। অন্ততঃ দূরপ্রাচ্য ও আঙ্গোরা উদ্ভিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গণ্ডোয়ানা উদ্ভিদের ফসিলের অস্তিত্ব তারই আভাস দিচ্ছে।

নিম্ন গণ্ডোয়ানা উদ্ভিদ-ফসিলের মধ্যে ইউরোপীয় উদ্ভিদ-ফসিল কি করে আসতে পারে, সে সম্পর্কে ডঃ সাহনির ধারণা : গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডে হিমবাহ নেমে এলেও সেখানকার কোন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে কোন কোন উদ্ভিদ-প্রজাতি কোন রকমে বেঁচেছিল। অধ্যাপক সাহনি যখন নিম্ন গণ্ডোয়ানার উদ্ভিদকুল নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত, প্রায় সে সময়টিতেই সাইবেরিয়া, চীন, কোরিয়া ও সুমাত্রার সমকালীন উদ্ভিদ সম্পর্কে অন্যত্র অনেক কাজ চলছে। একই ধরনের দু'টি প্রশ্ন নিয়ে সাহনি ভাবছিলেন : গণ্ডোয়ানা উদ্ভিদকুলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি কী এবং তাদের সংগে চীন ও সুমাত্রার উদ্ভিদকুলের মধ্যেই বা কি সম্পর্ক ছিল।

'ভাসমান মহাদেশ তত্ত্ব' (Theory of Continental Drift) সম্পর্কে ডঃ সাহনির গবেষণাপত্র থেকে কিছুটা উল্লেখ করলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে : 'এই দুই শ্রেণীর পুষ্পের বৈপরীত্য এমন লক্ষ্যণীয় যে, আলাদা আলাদাভাবে বিচার করলে মনে সন্দেহ হবে যে, যাদের একটি প্রধানতঃ উত্তরের এবং একটি প্রধানতঃ দক্ষিণের—এই দুই উদ্ভিদ বুঝি দুইটি ভিন্ন ধরনের জলবায়ুতে বেড়ে উঠেছিল। বাস্তবিক, এখনকার প্রচলিত ধারণা এই যে,

Glossopteris উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটেছিল সদ্য তুষারের আবরণ থেকে মুক্ত কোন নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে। আর, ইউরোপীয় কয়লা স্তর গড়ে ওঠার দিনের পরিবেশের অনুরূপ কোন উষ্ণতর আবহাওয়ায় *Gigantopteris*-এর উদ্ভব ঘটেছিল।'

দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণশিলাস্তর-বিন্যাসের ধারাবাহিকতা

মধ্যজীবীয় যুগের (Mesozoic) উদ্ভিদ নিয়ে অধ্যাপক সাহনির কাজ প্রধানতঃ Jurassic পর্বের, বিশেষ করে Lower Cretaceous উপ-পর্বের ফসিল নিয়েই নিবদ্ধ ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ আগ্নেয়শিলার ধারাবাহিকতার মধ্যে সিলিকায় রূপান্তরিত উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা। সিলিকায় রূপান্তরিত বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের মধ্যে পাললিক শিলার যে স্তর রয়েছে, সেগুলিই হচ্ছে Intertrappean বা আন্তঃআগ্নেয় শিলাস্তর ; এ সকল শিলাস্তর কৃষ্ণবর্ণের বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে Trap Rocks. যেহেতু এ সকল আগ্নেয়শিলার সৃষ্টি হয়েছে গলিত লাভা থেকে, সেজন্যই এইগুলিতে কোন জৈবিক অবশেষ নেই। আগ্নেয় শিলাস্তরগুলির মাঝে মাঝে মৃত্তিকাস্তরে নিশ্চয়ই জৈবিক বিকাশ ঘটেছিল এবং তাদের জীবন-ইতিহাসও সেখানে লুকিয়ে আছে। এ সকল আন্তঃ-আগ্নেয় শিলাস্তরেই ফসিল-উদ্ভিদ ও ফসিল-প্রাণীর সন্ধান মিলেছে। ভারতে প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে রয়েছে দাক্ষিণাত্যের এ সকল ফসিল। সিলিকা-উৎপাদী বিশুদ্ধ জলতলের পলি এবং Deccan Traps-এর মধ্যে যে স্তরবিন্যাস ঘটেছে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ-অবশেষের প্রাচুর্য রয়েছে। সেগুলি এমন অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে যে, সেগুলির সূক্ষ্ম গঠনও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভবপর।

অধ্যাপক সাহনি ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করলেন এভাবে ঃ যদি আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত ভস্মরাশি নিকটবর্তী কোন হ্রদ বা নদীর পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, তবে তারা এক ধরনের আগ্নেয়-তলানি বা পলির সৃষ্টি করে এবং নদী বা হ্রদের জলে যে সকল জীবজন্তু বা উদ্ভিদ থাকে তাদের জন্য অনন্তকালের সমাধি রচনা করে। এ সকল উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহ, দেহের প্রতিটি কণা, প্রতিটি কোষ এমনভাবে রক্ষিত হয় যে, মনে হবে তারা অমর। কোন বিভাজন নেই, কোন পরিবর্তন নেই। উদ্ভিদের কোষকলার স্থানে বসে যায় ভস্মরাশি থেকে উদ্ভূত সিলিকা। অথবা এমনও হতে পারে যে, লাভাপ্রবাহ এসে সেখানকার জীবজন্তু ও উদ্ভিদকুলের উপর এমনভাবে চেপে বসেছে যে, শেষ পর্যন্ত মূল উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর একটি অবিকল প্রতিলিপি কঠিন সিলিকার ওপর আঁকা হয়ে গিয়েছে। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় Petrification বা 'প্রস্তরায়ণ'। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভিদগুলির এমন নিখুঁত অবস্থায় রক্ষণ সম্ভবপর হয়েছে এজন্য যে, অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির ভস্মরাশির বর্ষণ, অথবা তরল লাভা এসে তাদের ঢেকে ফেলেছে। ফলে, জৈবিক অবশেষগুলির কোন ভবিষ্যৎ রইল না এবং প্রস্তরায়ণের আগে অন্য কোথাও পরিবাহিত হবার সম্ভাবনাও একেবারে মুছে গেল।

সর্বাধিক সুন্দরভাবে সংরক্ষিত উদ্ভিদ দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে চিচিনদোয়ারা জেলার সোসার নামক স্থানের চারদিকে বিশুদ্ধ জলাশয়ের পলিমাটির নিচে এবং তা হ'ল *Azolla*

intertrappean নামক সাধারণ প্রজাতিভুক্ত একটি জলজ উদ্ভিদ। এই পলিতে রয়েছে সিলিকায় পরিণত কর্দম এবং তার সংগে স্থানে স্থানে মিশে রয়েছে আগ্নেয়গিরির ভস্মরাশি। ছয় থেকে সাত কোটি বছর আগেকার Tertiary যুগপর্বের দক্ষিণাপথের এই *Azolla* উদ্ভিদ-প্রজাতি তাদের জীবন-ইতিহাসের প্রজনন পর্যায়ে কিরূপ দৃঢ়তার সংগে আপন উন্নত ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে চলার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে, *Azolla* তারই চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে শিলাস্তরের নিচে রয়ে গিয়েছে।

অধ্যাপক সাহনি *Azolla*-র ফসিল-উদ্ভিদগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং এ সকল উদ্ভিদের অংগ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও তাঁর পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। 1925 সালে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ বিশুদ্ধ জলতলে প্রাপ্ত কয়েকটি উদ্ভিদ-উৎপাদী পলিমাটি বা শিলাখণ্ড পাঠালে অধ্যাপক সাহনি তার একটিতে আধুনিক সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত অবশেষ খুঁজে পেলেন, যা প্রাচীনতর ফসিল-উদ্ভিদে একান্তই দুর্লভ। সাহনি এটা দেখামাত্রই এর গুরুত্ব যে কত বেশী তা বুঝতে পারলেন। কেননা, ইউরোপের Tertiary যুগের অন্ত্য-অধ্যায়ের যে কার্বন-সমৃদ্ধ ফসিলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাদের সংগে দাক্ষিণাত্যের এই পদার্থটি তুলনা করে দেখার একটি বড় সুযোগ হাতে এসে গিয়েছে। ইউরোপের Tertiary যুগের ফসিলগুলির মধ্যে এমন অনেকগুলিই রয়েছে যেগুলি আধুনিক ভারত-মালয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আন্তঃকৃষ্ণশিলা-স্তরের ভেতরে যে সকল একবীজপত্রী (monocotyledons) উদ্ভিদ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিতে অনেক কৌতূহল-উদ্দীপক প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। অতএব, সাহনি সেগুলি এবং সেখানে পাওয়া প্রস্তরীভূত পাম বৃক্ষকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক চর্চায় নেমে পড়লেন। আন্তঃকৃষ্ণশিলাস্তরের ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ 'কনিফার' (পাইন, ফারস্, স্প্রুস, জুনিপার প্রভৃতি) ক্রমে পরিচিত গোষ্ঠী সম্পর্কে সাহনির কাজ প্রধানতঃ মোচাকৃতি শীর্ষবিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং তাদের সিলিকায় রূপান্তরিত ফলের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যারা তারা আবার *Indostrobus* ও *Takliostrobus* এই দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাহনি কর্তৃক আবিষ্কৃত এই দুই শ্রেণীর উদ্ভিদ দৃষ্টি কেড়ে নেয় এজন্য যে, ওদের মধ্যে Abietinean ও Podocarpaceae-এর যুক্ত সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু সাহনি শ্রেণীবিভাগের সংগে প্রজননের সম্পর্কের প্রশ্নটি ভাবীকালের জন্য খোলা রেখেছেন।

পৃথিবীর গভীরে দাক্ষিণাত্যের সিলিকা স্তর ও কৃষ্ণশিলার স্তর-বিন্যাসের মধ্যে যে সকল ফসিল-উদ্ভিদ পাওয়া গিয়েছে, কেবলমাত্র তাদের দেহের গঠন ও দৈহিক সাদৃশ্য নিয়েই ডঃ সাহনি ব্যস্ত থাকেননি, সে সকল উদ্ভিদের জীবনকালের পরিবেশ, ভৌগোলিক সম্পর্ক ও ভূবিজ্ঞানের বিচারে এ সকল উদ্ভিদের বয়স নিয়েও পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর গবেষণার এই দিকটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, সে যুগে কি ধরনের উদ্ভিদ ছিল, তা জানা সম্ভবপর হয়। আবার ভূবিজ্ঞানের দিক থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সে যাই হোক, তিনি এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন এবং আধুনিককালের উদ্ভিদের সংগে বিগতকালের (ভূবিজ্ঞানের নিরিখে) ফসিল-উদ্ভিদের তুলনা করে পরিবেশের প্রশ্নে তিনি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে কখনও আসেননি। কিন্তু উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের কয়েকটি ঘটনা থেকে তিনি অনুমান করে নিতে পেরেছেন যে, যে Intertrappean বা কৃষ্ণশিলাস্তর-বিন্যাসের কালে দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে নাগপুর ও চিচিনদোয়ারার চতুঃপার্শ্ববর্তী অঞ্চলটি কোন এক সমুদ্র উপকূল থেকে বেশী দূরে ছিল না। এটাও জানা গিয়েছে যে, বর্তমান যুগে নদীর মোহনায় *Nipa fructicans* নামে যে পাম

বৃক্ষ জন্মায়, তাদেরই এক নিকট আত্মীয় বহু যুগ আগে বর্তমানে 'মহগোয়ান কালান' নামে পরিচিত অঞ্চলটিতে বাস করে গিয়েছে। কেননা, ঐ একই অঞ্চলে *Nipa fructican* বর্গের এক উদ্ভিদের ফসিলে পরিণত একটি ফলও আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই একই ভৌগোলিক এলাকায় আর একটি ফসিলও আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটির সংগে আধুনিক নারকেল 'পাম'-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ডঃ সাহনি বিভিন্ন সময়ে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণশিলাস্তরের উদ্ভিদের সংগে Eocene যুগের London Clay-র নিচে লুকিয়ে থাকা উদ্ভিদের সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন, *Nipa*-র ফসিলে পরিণত ফল London Clay-র মধ্যে হামেশাই দেখা যায়। বদ্ধ জলাশয় বা অগভীর সমুদ্রের এই 'ফসিল রেকর্ড' সুপ্রাচীন Tethys সাগরের উপকূলের মোটামুটি একটা আভাস দিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে Tethys সেদিন নিশ্চয়ই দাক্ষিণাত্যের উত্তর উপকূল বিধৌত করেছিল। বর্তমানে চিচিনদোয়ারা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে উপকূলের দূরত্ব খুব বেশী ছিল না। সাহনির গবেষণায় পরিষ্কার দেখানো হয়েছে যে, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণশিলাস্তর গড়ে ওঠার যুগে উপদ্বীপ ভারতে এমন বহু ধরনের গাছগাছড়ার বাড়বাড়ন্ত ছিল যেগুলির বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ Tertiary যুগের আদি পর্বের পশ্চিম ইউরোপীয় উদ্ভিদের মধ্যেই দেখা যায়।

ভূবিজ্ঞান, ফসিল-বিজ্ঞান ও আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের সমাবেশ করলে সুপ্রাচীন ভারতের যে চিত্রটি ফুটে ওঠে, অধ্যাপক সাহনি 1940 সালে মাদ্রাজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 27 তম অধিবেশনে বিজ্ঞানীদের সামনে তা মেলে ধরে বললেন ঃ

'আমি যা' বলতে যাচ্ছি, তা' কল্পকাহিনীর মতো শুনালেও আপনারা অনুগ্রহ করে তা শুনুন। কত যুগ-যুগান্ত পার করে আজ আমরা যেখানে এসেছি, সেখান থেকে সেই সুপ্রাচীন পৃথিবীর একটি আবছা অস্পষ্ট সীমারেখাই শুধু দেখা যায় এবং যৎসামান্য যা' দেখা যায়, বিজ্ঞানের বাহুল্যবর্জিত আঁটোসাঁটো ভাষা সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নসুন্দর জগতের বর্ণনা দেবার কোন ক্ষমতাই রাখে না।

'এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতে, ছয় থেকে সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে Tertiary যুগ-পর্ব শুরু হয়। ভূবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রকৃত অর্থেই এটাকে "নবযুগ" বা New Era বলা হয়। সেই নবযুগে এক প্রচণ্ড শক্তি পৃথিবীর জঠরের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে নিচ থেকে ভূত্বককে আঘাত করতে শুরু করল—সৃষ্টি হল ফাটল, মহাসমুদ্রের নিচ থেকে ফুঁড়ে উঠে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আকাশের দিকে হাঁ করে রইল। ভূত্বকের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফাটলগুলি থেকে মাঝে মাঝেই গলিত শিলা লাভা হয়ে বেরিয়ে আসছে। স্থল ও জলের লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এক লহমায় ঢেকে ফেলছে। সংগে সংগেই আবার শুরু হল আগ্নেয়গিরির অগ্নিবর্ষণ। বর্ষিত ভস্মরাশি মহাদেশ-প্রায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করছে, মুহূর্তে মুহূর্তে ভূ-পরিচিতির পরিবর্তন ঘটছে, পৃথিবী নতুন বেশ ধারণ করছে। কোথাও বা সু-উচ্চ আগ্নেয়গিরি বহু বিস্তীর্ণ মালভূমি মাথায় নিয়ে উর্ধ্বপানে উঠছে, নতুন ধরনের তৃণগুল্মের আচ্ছাদনে পৃথিবী এক নতুন রূপসী। আজ আমাদের কাছে যারা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিচিত, সেই প্রাণিকুল স্থলে, নদীতে বা হ্রদে ভিড় করে আসতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও মানুষ আসেনি। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ তার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু নায়ক-নায়িকার দেখা নেই; এই সন্ধিক্ষণে বিরাট বিরাট দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী সমুদ্র থেকে মাথা

তুলে দাঁড়াতে শুরু করল। ভারতের উত্তরে কোথাও পৃথিবীর স্ফীত ও কম্পমান বুকের ওপর মানব-প্রজাতির শৈশব-খেলা শুরু হবে তারই প্রস্তুতি চলছে সব দিকে।

'এই হল Eocene যুগ, আক্ষরিক অর্থেই যাকে বলা যায় "নতুনের শৈশবভূমি"।

'ভারতীয় উপদ্বীপের বৃহত্তর অংশ এমন শিলা দিয়ে গঠিত যেগুলি গলিত অবস্থা থেকে কঠিনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ সকল শিলা যে আগ্নেয় আভাস দিচ্ছে, তা' থেকে মনে হয় যে, ব্যাপারটি একবারে ঘটেনি, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে বিভিন্ন যুগ ধরে বারবার এইরূপ ঘটেছে। ব্যবধানটি কত দিনের তার হিসেব দেওয়া এখনও সম্ভবপর নয়।

'ভারতীয় উপদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ পৃথিবীর প্রাচীনতম স্থলপৃষ্ঠগুলির অন্যতম। গ্যাসীয় বা তরল পদার্থ শীতল হয়ে বা জমাট বেঁধে যেদিন এই গ্রহটি সৃষ্টি হল, সেদিনের পৃথিবীর সেই আদি ত্বকের অংশবিশেষ এখানে, অর্থাৎ ভারতেই রয়েছে।

'মাঝে মাঝে অন্যান্য গলিত শিলাও এই ত্বক ছিন্ন করে উপরে উঠে এল এবং ফাটলের মধ্যেই কঠিনে রূপান্তরিত হয়ে প্রাচীনতর শিলাস্তর ভেঙে দিয়ে প্রশস্ত প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গেল। তরুণী পৃথিবীর সেদিনকার প্রচণ্ড আলোড়ন-বিলোড়নের কাহিনী প্রাচীন শিলা প্রাচীরের জটিল গঠনের ভাঁজে ভাঁজে আজও লিপিবদ্ধ রয়েছে। পৃথিবীর অবিরাম অস্থিরতার ফলে মূল শিলাগুলি এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে অথবা এমন চারিত্রিক পরিবর্তন তাদের ঘটেছে যে, এখনও আমরা ওদের সৃষ্টির মূল রহস্যটিই ধরতে পারছি না।

'ভূবিজ্ঞানের কাল-নির্ঘণ্টের দিক থেকে সুদূর অতীতের যে দৃশ্যপট মেলে ধরা হল, সেখানেই জীবনের প্রথম উদ্ভব ঘটল জলে এবং তার ওপরেই পৃথিবীর ত্বক স্তরে স্তরে ভাঁজে ভাঁজে স্থাপিত হল। কালক্রমে এই বহির্ত্বকের বৃহদংশই ক্ষয়ে গেল এবং পুরোনো বহির্পৃষ্ঠ আবার উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এই স্তর-সমষ্টির অংশবিশেষ মহানদী, গোদাবরী ও নর্মদার ন্যায় প্রাচীন নদীগুলির অববাহিকায় দ্রোণীর মতো গভীর অঞ্চলে এবং পূর্ব উপকূলে ত্রিচিনপল্লী থেকে কটক পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের স্থানে স্থানে এখনও রয়ে গিয়েছে। এ সকল পলিস্তর জমেছে প্রধানতঃ হ্রদে বা নদীতে; কিন্তু আংশিকভাবে তাদের এখনও দেখা যাচ্ছে অগভীর সমুদ্রেও—যে সমুদ্র উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে বারবার ধেয়ে এসে স্থলভূমিকে প্লাবিত করে গিয়েছে। এ সকল আন্তস্তরে যে বিপুল পরিমাণ সাক্ষ্য ও প্রমাণ রয়েছে, তারাই বলে দিচ্ছে দক্ষিণের সেই মহা-মহাদেশের অখণ্ড অংশ ছিল ভারত; সেখানকার আবহাওয়ায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, পরম্পরানুসারে প্রাণিকুল ও উদ্ভিদকুলের আগমন ও প্রস্থান অতি দীর্ঘকাল ধরে চলেছে।

'আমরা যতটা জানি, স্থলভাগে সমুদ্রের এই সাময়িক অথচ পৌনঃপুনিক প্লাবনের কথা বাদ দিলে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি মূল ভূত্বক গড়ে ওঠার দিন থেকে আজ পর্যন্ত একটি স্থল এলাকা রূপেই রয়ে গিয়েছে। ...'

এই অশান্ত, উদ্গমশীল যুগের আগে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাহনি বলেন ঃ

'উত্তরের মহাসমুদ্রও নিম্ন নর্মদা অঞ্চলের স্থলভূমিকে বারবার প্লাবিত করেছে। কিন্তু যেহেতু মালভূমির প্রাচীর এটাকে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, সেজন্য এখানকার প্রাণিকুলের সংগে দক্ষিণের প্রাণিকুলের বৈসাদৃশ্য রয়েছে ... উত্তরের প্রাণিকুলের সংগে ইউরোপীয় প্রাণিকুলের অধিকতর সাদৃশ্য ধরা পড়েছে। আসলে, একই মহাসমুদ্রের বিস্তৃতি ছিল একপ্রান্তে ইউরোপ এবং অন্যপ্রান্তে তিব্বত ও চীনের মধ্যে।

'কিন্তু এই যুগে আমাদের পশ্চিম উপকূলের চেহারা সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না। হতে পারে, ভারত তখনও আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, অথবা যেটির সম্ভাবনা অধিকতর, তা' হচ্ছে এই যে, পশ্চিম উপকূল এক বিরাট ভূখণ্ডকে টেনে নিয়ে এসেছে যার অবস্থিতি ছিল পশ্চিমে। এই ভূখণ্ড ডুবে যাবার ফলে ভারত ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী উপসাগর প্রশস্ততর হয়ে আরব সাগরের রূপ নিয়েছে এবং আমাদের দাক্ষিণাত্যের ত্রিকোণাকার দ্বীপটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে নোঙরহীন ভেলার মতো এবং তা' ভেসে চলতে শুরু করেছে উত্তর-পূর্ব অভিমুখে।

'এই যুগে স্থলবাসী প্রাণিকুলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে---মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চলে 'ডাইনোসোরের' দাপাদাপি চলছে প্রচণ্ডভাবে। তাদের মধ্যে কোন কোনটি আবার এমন আকৃতির যেগুলি ভারত ছাড়া অন্যত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অদ্ভুত কথাটি হচ্ছে এই যে, মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ আমেরিকার 'ডাইনোসোরদের' মধ্যে তাদের নিকটতম আত্মীয়বর্গরা রয়েছেন ; অতএব, দাক্ষিণাত্যের ত্রিকোণাকার দ্বীপটি নিঃসঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও এমন কোন স্থল-সংযোগ নিশ্চয়ই ছিল যার সুযোগ নিয়ে এ সকল সরীসৃপ দেশ থেকে দেশান্তরে যাতায়াত করতে পেরেছে। কিন্তু তাদেরও মুছে যাবার দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। ভারতীয় ডাইনোসোরের শেষ বংশধররা জব্বলপুরের কাছে লামেতা ফসিলক্ষেত্রে এবং ওয়ার্ধার দক্ষিণ-পশ্চিমে ওয়ারোরার কাছে পিসাধুরা গ্রামে মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত রয়েছেন।'

কাশ্মীরের কারেওয়া সংগ্রহাবলী

যে সকল উঁচু মালভূমি বা সকল উঁচু জায়গা---যেগুলি কাশ্মীর উপত্যকার বৃহৎ অংশে, বিশেষতঃ, ঝিলাম নদীর বাম তীর জুড়ে রয়েছে---কাশ্মীরী ভাষায় সেগুলির নাম হচ্ছে 'কারেওয়া'।

1936 সালের কথা। অধ্যাপক সাহনি বললেন, Pleistocene যুগে হিমালয়ের উৎক্ষেপ বা ঊর্ধ্বগামিতার যে তত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করে এসেছেন তার সমর্থনে কাশ্মীরের কারেওয়ার মৃত্তিকাস্তরে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। হিমালয়ের চূড়ায় সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল-অবশেষ এবং কাশ্মীরের পর্বতমালার উঁচু ঢালুতে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ হ্রদ-গর্ভের তলদেশের পলিস্তরে যে সকল জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তা' দেখে অ-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বাসা বেঁধে রয়েছে যে, পর্বতশীর্ষগুলি বুঝি কোন এক সময়ে কোন এক মহাসাগরে নিমজ্জিত ছিল এবং হ্রদগুলিও অবশ্যই অনেক উচ্চতায় ছিল। জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ফসিল-অবশেষ এবং সেই সংগে হ্রদের জলতলে পলিমাটির স্তরে এ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের আধুনিক প্রজাতির অবশেষ পাওয়া গিয়েছে পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর ঢালুতে এবং তাও এমন উচ্চতায় যেখানে আজকের দিনের এসকল প্রজাতি থাকতেই পারে না। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উঁচুতে পাওয়া জীব-উদ্ভিদাশ্মগুলি ভূবিজ্ঞানীদের কাছে 'কারেওয়া সিরিজ' বা কারেওয়া সংগ্রহাবলী নামে পরিচিত। এত উঁচু জায়গায় প্রত্নসম্পদের এই বিপুল প্রাচুর্যের ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক সাহনি বলেছেন ঃ 'Dr Stewart-এর কথা মেনে নিয়ে বলতেই হবে যে, গুলমার্গের কাছে (8,800 ফুট) ফসিল

ধারণের ক্ষমতাবিশিষ্ট যে পলির স্তর রয়েছে, সেগুলি পীর পাঞ্জালের উত্তর-পূর্ব ঢালুতে কাদা, বালি ও পাথরের নুড়িসহ অন্যান্য তলানির মতোই নিঃসন্দেহে কোন হ্রদগর্ভজাত বলেই স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু সেই হ্রদের তলদেশ আজ যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেই বিরাট উচ্চতায় সে কোন দিনই ছিল না। 11 হাজার ফুট বা তদূর্ধ্বে এখন যেসকল ফসিল-অবশেষ পাওয়া যাচ্ছে সেসকল প্রাণী ও উদ্ভিদ এই হ্রদের আশেপাশেই একদা জন্ম নিয়েছিল, বেড়ে উঠেছিল। তারপর পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী আরও উপরের দিকে উঠে গিয়েছে এবং সেই সংগে পলিমাটির স্তর ও তাদের আনুভূমিক অবস্থান আরও পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠে গিয়েছে।

দশ হাজার ফুট বা আরও উঁচুতে কাশ্মীরের কারেওয়া স্তর-সমষ্টিতে এমন সকল উদ্ভিদের ফসিল পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি কেবলমাত্র আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বর্ষণ-স্নাত অরণ্যে চার হাজার থেকে ছয় হাজার ফুট উঁচুতে জন্মাতে পারে। ভারতে এমন অসাধারণ উচ্চতায় গরম আবহাওয়ার উদ্ভিদ কি করে জন্মাল, তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। অধ্যাপক Frederick E. Zeuner-এর মতে ঃ 'এর ব্যাখ্যা মাত্র দু'ভাবে হতে পারে। হয়, কারেওয়া যুগের আবহাওয়া এমন ছিল যে, তখনকার উদ্ভিদ বর্তমানের তুলনায় আরও পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে জন্মাতে পারত; অথবা এমনও হতে পারে যে, হ্রদটির তলদেশ গড়ে ওঠার পর ভূ-দেহে এমন ওলট-পালট ঘটেছে যে ওই উদ্ভিদকুল নিয়েই হ্রদের তলদেশটি উপরে উঠে গিয়েছে। এর মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনাটিই বেশী। যে ধরনের ভাঙাচোরা শিলাস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাতে প্রচণ্ড তুষার ধসের আভাসই পাওয়া যাচ্ছে।' সাহনির মতে, 'অস্বাভাবিক রকমের কম উচ্চতায় পাওয়া শীতপ্রধান অঞ্চলের উদ্ভিদের অস্তিত্ব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, হিমবাহের একটি প্রবাহ ওই অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে।' সাহনি ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে, এই উৎক্ষেপ বা উর্ধ্বগামিতার সংগে পীর পাঞ্জাল পর্বত-শ্রেণীর গড়ে ওঠার কাহিনীরও সম্পর্ক রয়েছে। পীর পাঞ্জাল যে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে সেটা সেই প্রচণ্ড অভ্যুত্থানেরই অংশমাত্র যা' একদিকে মূল হিমালয় পর্বতশ্রেণী এবং অন্যদিকে পটওয়ার মালভূমিকে (রাওয়ালপিণ্ডি ও ঝিলামের মধ্যবর্তী অঞ্চল, এখন পাকিস্তানে) নাড়া দিয়ে প্রভাবিত করেছে, পীর পাঞ্জালে তারই একটি অধ্যায়ের অংশমাত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং সেটা ভূবিজ্ঞানের কাল-নির্ঘণ্টের এমন এক পর্যায়ে যার আগেই মানব-প্রজাতি পৃথিবীর এই অংশে স্থিতিশীল হয়ে বসেছে।

অধ্যাপক সাহনির মতে, '······ কোন কোন স্থানে কারেওয়া পলিস্তর প্রাচীন শিলাতলের ওপর স্থিতিশীল থেকে এই অভ্রান্ত কথাটিই বলে যাচ্ছে যে, কোন একদিন হিমবাহ তার প্রচণ্ড ভার নিয়ে তার ওপর দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে চলে গিয়েছে, চলার পথের দাগও রেখে গিয়েছে, পলির স্তরে প্রান্তিক রেখারও সৃষ্টি করেছে। অন্যত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ফসিলে পরিণত করার উপযোগী কাদামাটিও রয়েছে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে জীবনের যেসকল লক্ষণ দেখা যায়, যেমন বিশুদ্ধ জলে জলজ-প্রাণীর খোলস বা কঙ্কাল এবং আরণ্য বৃক্ষের পাতাও পাওয়া যাচ্ছে। তারই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্তরে হিমবাহসৃষ্ট ফসিল; তারাই বলে দিচ্ছে একদিন এখানে, এই কাশ্মীরে, বর্তমান উত্তর মেরুর পরিবেশ ছিল······এমনকি, খাস গুলমার্গের তৃণভূমির —যেখানে চমৎকার গল্‌ফ খেলার মাঠ রয়েছে—নিচে ফসিলে পরিণত হবার উপযোগী যে আন্তর্হিমবাহ কাদামাটি রয়েছে তাও সে অঞ্চলে এঁকেবেঁকে প্রবহমান পার্বত্য নদীগুলির তীর-প্রাচীরে আজও তা' অনাবৃত দেখা যায়। আন্তর্হিমবাহ কর্দমস্তর পচা উদ্ভিদ-অবশেষগুলিকে

প্রায় কৃষ্ণবর্ণ করে তুলেছে। নীল ধূসর বর্ণের স্তরে বিশুদ্ধ জলের অধিবাসী প্রাণী (mollusca) কম্বোজ, বিশেষ করে, শামুকজাতীয় উভচর প্রাণীর (gasterpods) দেহাবশেষ—এরা সকলেই সে যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন এই অঞ্চলটি অনেকটা নিম্নভূমিতে ছিল এবং জলজ প্রাণীর প্রাচুর্য নিয়ে একটি হ্রদের এখানে অস্তিত্ব ছিল। তারপর এল এক তীব্র শৈত্যপ্রবাহ ও তোসময়দান এবং যে পর্বতশীর্ষকে আজ আমরা আফারওয়াথ নামে চিনি, এই দুই স্থান থেকে হিমবাহ নেমে এল হ্রদের ওপর। নিম্নাভিমুখী এই প্রচণ্ড শক্তি পাহাড়-পর্বত থেকে ছিঁড়েফুঁড়ে আনা অংশগুলি নিয়ে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপরূপে নেমে এল কাশ্মীরের এই হ্রদে। শেষ পর্যন্ত যখন তুষার-ধারা পেছনে হটে যেতে শুরু করল, তখন পেছনে পড়ে রইল কাদা, মাটি বিভিন্ন আকারের কৌণিক শিলাখণ্ডের স্তূপ ; এগুলি রইল পাথরের ঢিবি হয়ে। ওদের সেদিনের চেহারার ইতরবিশেষ ঘটেনি, আজও প্রায় সেই একই অবস্থায় ওদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।'

লোকপরম্পরায় কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কে যেসকল কাহিনী চলে আসছে, সেগুলির সংগে এসকল তথ্যের চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। স্মরণাতীতকাল থেকেই এই কাহিনী প্রচলিত আছে যে, সারা কাশ্মীর উপত্যকা একদিন বাস্তবিক একটি হ্রদই ছিল। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক বিবরণের সংগে প্রচলিত কাহিনীর এক অপূর্ব সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে ডাল, মানসবাল, উলার ও অন্যান্য শত শত হ্রদ যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলি Pleistocene যুগের বিরাট হ্রদেরই সংকোচনশীল অংশরূপে আজও তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। Pleistocene যুগের সেই বিরাট হ্রদের তটভূমিতে একদা প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষেরা (Palaeolithic Man) ঘোরাফেরা করে গিয়েছে।

স্পিটির পো' অঞ্চলের প্রত্নসম্পদ

অধ্যাপক সাহনি 1937 সালে W. Gothan-এর সংগে যুগ্মভাবে স্পিটির পো' অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে আনা অঙ্গার-উৎপাদী যুগের শেষের দিকের (Lower Carboniferous) কয়েকটি মূল্যবান উদ্ভিদের বিবরণ দেন। স্পিটির পো' গ্রামের আশেপাশে ফসিলগুলি পাওয়া গিয়েছে বলে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে Po Series বা পো'র সংগ্রহাবলী। কানেওয়ার পাহাড়শ্রেণীর উর্ধ্বাংশে প্রায় দু' হাজার ফুট পুরু যে কোমল প্রস্তর ও স্ফটিকস্তর (quartzites) রয়েছে, সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা পদার্থগুলি এই 'সিরিজ'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংগ্রহগুলি আবার দুই অংশে বিভাজ্য। নিম্ন অংশে রয়েছে কৃষ্ণবর্ণের কোমল প্রস্তর, যেগুলি আগ্নেয় অনুপ্রবেশের ফলে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইতস্ততঃ ছড়ানো কোমল প্রস্তর উদ্ভিদপত্রের ছাপ নিয়ে আজও অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। এই 'সিরিজ'-এর উর্ধ্বাংশ যাকে বলা হয় Fenestella Shales, সেখানে জলজ প্রাণীর দেহাবশেষেরও অনেক সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

Zeiller অনেক আগেই ফসিলগুলি চিনতে পেরেছিলেন। উপরোক্ত দুই বিজ্ঞানী (সাহনি, Gothan) তাঁর এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলে স্বীকার করে নেন। Zeiller-এর বক্তব্য ছিল, এসকল ফসিল প্রাক্-হিমবাহ যুগের উদ্ভিদেরই দেহাবশেষ। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অঞ্চল থেকেও

এই উদ্ভিদের রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে, যা' থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সর্বত্রই কম-বেশী সমভাবেই এই শ্রেণীর উদ্ভিদের বিকাশ ঘটেছিল। গণ্ডোয়ানা হিমবাহ যুগের ভূতাত্ত্বিক বয়স কত হতে পারে, সেই বিতর্ক প্রসঙ্গে Zeiller আগাগোড়াই বলে এসেছেন যে, Carboniferous period বা অঙ্গার-উৎপাদী যুগের অবসানের অনেক আগেই সেখানে তুষার-যুগ নেমে এসেছিল।

তুষারস্তূপের এই প্রবাহ উত্তর গোলার্ধের সব কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে এসে হাজির হল এবং জীবনের বহু বিকাশকে ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারে মুছে যেতে বাধ্য করল। জলাভূমি থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে সেগুলিকে একেবারে শুকিয়ে দিল, সর্বত্র বিরাট বিরাট পর্বতমালা মাথা তুলে দাঁড়াল; ভূপৃষ্ঠে বা জলতলে যেখানেই উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল, তারা বেঁচে থাকার তাগিদে অস্তিত্বের নতুন নতুন উপায় খুঁজে নিতে বাধ্য হল। এই অধ্যায়ে অতিকায় শৈবাল এবং বৃক্ষরূপী 'ফার্ণ' অদৃশ্য হয়ে গেল, আবহাওয়ার পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী স্থলভাগের চেহারা বদলে গেল। তুষার যুগের মধ্যবর্তী অধ্যায়ে আন্তহিমবাহ পর্বে তুলনামূলক-ভাবে পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের বাড়ন্ত অবস্থা, কয়েকটি প্রজাতি আবার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে শীতল আবহাওয়ার সংগে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে বেঁচেও ছিল। বিভিন্ন সময়ে ডঃ সাহনি বলেছেন, তুষার-যুগ এসে যে পৃথিবীর সর্বত্র বেঁচে-থাকা ও বেড়ে-ওঠা *Glossopteris* বর্গের উদ্ভিদের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিল—এই অভিমত তিনিও সমর্থন করেন।

রাজমহল পাহাড়ে প্রত্নসম্পদের সন্ধানে

Jurassic যুগের রাজমহলের উদ্ভিদশ্রেণীর মধ্যে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের উদ্ভিদের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণাই অধ্যাপক সাহনির মনকে বিশেষভাবে টানত। Oldham, Morris ও Feistmantel প্রমুখ ভূবিজ্ঞানীরা আগেই রাজমহল পাহাড়ের গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের উচ্চতর স্তরে প্রাপ্ত সামগ্রী নিয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু সাহনির গবেষণা শুরু হবার সংগে সংগেই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল এবং তিনি অজ্ঞাতপূর্ব ও আকর্ষণীয় ফসিল-উদ্ভিদ আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি কয়েকটি নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং *Ontheodendron* ও *Rajmahalia* নামে দু'টি নতুন বর্গের উদ্ভিদ খুঁজে পেলেন। রাজমহলে প্রাপ্ত সামগ্রীর মধ্যে যেমন রয়েছে ছাপ, তেমনই রয়েছে প্রস্তরায়ণের নমুনা। কিন্তু প্রস্তরায়ণের ব্যাপারটিই উক্ত অঞ্চলের ফসিল-উদ্ভিদের গবেষণাই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল।

অধ্যাপক সাহনির গবেষণাকার্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে *Williamsonia Sewardiana* (1932f) নামক ফসিলের ক্ষেত্রে; Bennettitales বর্গের উদ্ভিদ সম্পর্কে আগে যা' জানা ছিল, তার সংগে অনেক কিছুর সংযোজন ঘটিয়েছেন তিনি। যদিও রাজমহল সংগ্রহাবলীর প্রাপ্ত উদ্ভিদ-ফসিলের কাণ্ড, পাতা ও তথাকথিত 'পুষ্প'-এর (বর্তমান যুগে এই উদ্ভিদ অপুষ্পক) অস্তিত্ব আগেই জানা ছিল, কিন্তু মাত্র একটু নমুনা ছাড়া প্রত্যেকটিই এমন অসংবদ্ধ ছিল যে, তাদের একটি পুরোপুরি উদ্ভিদরূপে নতুন করে গড়ে তোলা কঠিন ছিল। বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার আমরাপাড়ার দু'টি নমুনার ওপরই সাহনিকে প্রধানতঃ মন নিবিষ্ট রাখতে হয়েছিল। দু'টি নমুনার মধ্যে একটিতে ছিল পাতার দাগ, Rachise-অবশেষ,

মঞ্জরীপত্র এবং একটি নারী-পুষ্প। *Williamsonia scotica* নামের পুষ্পের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তার সংগে এই পুষ্পের সাদৃশ্য রয়েছে। সযত্নে উভয়ের তুলনা করে ডঃ সাহনি প্রমাণ করলেন—এই পুষ্প সেই জাতের গাছ থেকেই এসেছে যার কাণ্ড ছিল *Bucklandia Indica* শ্রেণীর এবং পাতা ছিল *Ptilophyllum* শ্রেণীর। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অংশগুলির খণ্ড ফসিল জুড়ে নিয়ে যে উদ্ভিদটি গড়ে তোলা হল, ডঃ সাহনি তার নতুন নামকরণ করলেন *Williamsonia Sewardiana*।

রাজমহল অঞ্চলের নিপানিয়া ও আমরাপাড়ায় সিলিকায় পরিণত কোমল শিলাখণ্ড পাওয়া গিয়েছে যাতে রয়েছে মোটামুটি সুরক্ষিত প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ-অবশেষ। অধ্যাপক সাহনি তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীদল সংগে নিয়ে ঐ অঞ্চলে আরও ফসিলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন এবং বহু নমুনা সংগ্রহ করে আনলেন। বস্তুতঃ, মৃত্যুর তিন মাস আগে তাঁর শেষ পর্যটনটিও ছিল বিহারের এই অঞ্চলটিতেই।

পেন্‌টক্সিল

অধ্যাপক সাহনি বিহারের রাজমহল পাহাড়ের ফসিল-সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে যে প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ করে আনেন, তার অধিকাংশই সিলিকায় পরিণত হয়ে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু কোন কোন শিলাস্তরে শুধুমাত্র উদ্ভিদদেহের ছাপও দেখা গিয়েছে। রাজমহল পাহাড়ের নিপানিয়া গ্রামে এই প্রস্তরায়ণের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফসিল-উৎপাদী এক সমৃদ্ধ হ্রদগর্ভে মোটামুটি পুরু পলিস্তরের মধ্যেই তাদের সব কয়টিকে পাওয়া গিয়েছে। বিশুদ্ধ জলের নিচে গড়ে-ওঠা এসকল পলিমাটির স্তরের সংগে ব্যাপক লাভাপ্রবাহজনিত কঠিন স্তরের ক্রমানুপাতিক অবস্থানের ফলে উভয়স্তর পরস্পরের সংগে মিশে গিয়েছে এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমির মতোই এসকল আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত শিলা সারিবদ্ধ পাহাড়শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে এবং সেখানকার ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অনির্বচনীয় সুন্দর করে তুলেছে।

রাজমহল পাহাড়শ্রেণী বিজ্ঞানীদের নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসিল-নমুনা উপহার দিয়েছে এবং অধ্যাপক সাহনি সেখানকার বিশিষ্ট উদ্ভিদবর্গের কয়েকটির বর্ণনাও দিয়েছেন। এই বর্গের মধ্যে রয়েছে *Homoxylon rajmahalense*, *Rajmahalia paradoxa* এবং সুপরিচিত নমুনা *Williamsonia Sewardiana*. সে যাই হোক, ফসিল-উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডঃ সাহনির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদানরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে একটি ব্যক্তবীজী (gymnosperm) উদ্ভিদের আবিষ্কার। উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিসীম মূল্য রয়েছে যার, সেই নতুন আবিষ্কৃত ব্যক্তবীজী উদ্ভিদটির তিনি নাম দিয়েছেন *Pentoxyleae*. নিপানিয়া ও আমরাপাড়ার ফসিল নিয়ে গবেষণার অগ্রগতির সংগে জুড়ে রয়েছে একটি কৌতূহল জাগানো কাহিনী। এতদিন জানা ছিল ফার্ণ, Cycadales ও Bennettitales প্রভৃতি উদ্ভিদ *Taeniopteris* বর্গের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধ্যাপক সাহনি দেখালেন যে, আধুনিক Cycads-এর সংবহন নালিকার গঠন এবং নিপানিয়া পাতার মধ্য-শিরার mesarch সংবহন নালিকা প্রায় একই ধরনের। Pentoxyleaeতে কনিফার, Bennettitales এবং Cycadales প্রভৃতি সব শ্রেণীর উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যেরই সমাবেশ রয়েছে। অংগসংস্থানবিদ্যার দিক থেকে বিচার করে দেখা গেল, বৃক্ষশাখায় পুষ্প প্রস্ফুটনের ধারা, ওদের মোচাকৃতি দেহ,

বিশেষ করে ওদের কাণ্ডের সংবহন নালিকার সংগে অন্যদের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। সেদিক থেকে ওরা একেবারে নিঃসঙ্গ। সৌভাগ্যের বিষয় ডঃ সাহনির Pentoxyleae সংক্রান্ত গবেষণাগুলি ইতিমধ্যে এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁর শেষ প্রকাশনায় সেগুলিকে স্থান দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। অধ্যাপক সাহনির এই শেষ গবেষণার গুরুত্ব মনে রেখেই Pentoxylon-এর পুনর্গঠন ব্যাপারে তাঁর তৈরি নকশাকেই 'Birbal Sahni Institute of Palaeobotany'র সীলমোহররূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

লাবণিক পাহাড়শ্রেণীর সংগ্রহাবলী

1944 সালে অধ্যাপক সাহনি ঘোষণা করলেন Punjab Salt Range বা পাঞ্জাবের লাবণিক পাহাড়শ্রেণীতে তিনি micro-fossil বা অণু-পরিমাণ ফসিলের নানা নমুনা খুঁজে পেয়েছেন। এসকল নমুনা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে তারা Cambrian যুগের তো নয়ই; বরং Jurassic পরবর্তী যুগ-পর্যায়ের হতে পারে এবং খুব সম্ভবতঃ Eocene যুগেই এদের উদ্ভব ঘটেছিল। micro-fossil বলতে বুঝতে হবে উদ্ভিদের পুষ্পরেণু, পরাগ বা উদ্ভিদের বহিশ্চর্মগত স্তর যাদের অবশেষ ফসিলে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

লবণ পাহাড়ের এসকল সংগ্রহের বয়স নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা ষাট বছরেরও বেশী সময় মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু হদিশ পাননি। 1902 সালে দুই জন জার্মান ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক E. Koken এবং ডঃ F. Noetling একটি চাঞ্চল্যকর কথা বলে বসলেন। কথাটি হচ্ছে এই যে, লবণ পাহাড়ের এই সঞ্চয়গুলি যদিও Palaeozoic শিলাস্তরের নিচেই রয়েছে, তথাপি ভূবিজ্ঞানের বিচারে এদের বয়স Palaeozoic থেকে অনেক কম এবং এগুলি Eocene যুগের Tertiary বা তৃতীয় যুগ পর্যায়-ক্রমের বলেই মনে হচ্ছে। কি অবস্থায় এমনটি ঘটতে পারল তার ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা দু'জনেই বললেন ঃ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক প্রচণ্ড উর্ধ্বগামিতা, বা উৎক্ষেপ Cambrian শিলাস্তরকে (যার উলম্ব উচ্চতা হবে কয়েক হাজার ফুট) দক্ষিণ দিকে অনেক মাইল ঠেলে নিয়ে লবণ পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়ে দিয়েছে।

খেওরার লাবণিক পাহাড়শ্রেণী সম্পর্কে অধ্যাপক সাহনির কৌতূহল তাঁর শৈশবকাল থেকেই। যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি বাবা ও ভাইদের সংগে সে অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, লবণ পাহাড়ের এই রহস্য দীর্ঘকাল তাঁর মনে বিঁধেছিল। অবশেষে 1947 সালে তিনি জানালেন ঃ 'চার বছর আগে ছাত্রদের নিয়ে যখন আমি খেওরার লবণ-খনিতে গেলাম, তখন মনে হল সেখানকার খানিকটা নোনা মাটির নমুনা জলে মিশিয়ে নিয়ে সেই নোনা জলকে মাইক্রোস্কোপের নিচে পরীক্ষা করলে বোধহয় মন্দ হয় না। যেহেতু কোন উপসাগর বা উপহ্রদ শুকিয়ে গিয়ে এই লবণ উঠেছে, অতএব এই লবণাক্ত জলে অতি সামান্য হলেও সেই কল্পিত জলাশয়ের বাসিন্দাদের জৈব-অবশেষ থাকবেই এবং সেসকল অবশেষ পরীক্ষা করেই লবণ পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক বয়সের রহস্যটি ধরা পড়বে। আমার এই অনুমান নির্ভুল প্রমাণিত হল। পরীক্ষিত নোনা জলের মধ্যে দ্বিবীজপত্রী ও "কনিফার"-এর কাষ্ঠময় কোষ-কলা পাওয়া গেল। পাওয়া গেল ডানাওয়ালা পতঙ্গের অতি ক্ষুদ্র দেহাবশেষের ভগ্নাংশও। সন্দেহ রইল না, এসকল টুকরো হয়ত অন্যত্র থেকে জলের তোড়ে ভেসে এসেছে অথবা বাতাস তাদের

কোথাও থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে হ্রদের জলপৃষ্ঠে স্থাপিত করেছে। পরিষ্কার বোঝা গেল সমুদ্র, হ্রদ বা উপহ্রদ যাই হোক না কেন, তাদের অস্তিত্বের দিনে যদি এই প্রাণিকুল বেঁচেই ছিল, তবে এই লবণ পাহাড় কিছুতেই "Cambrian" যুগের মতো এত প্রাচীন হতে পারে না।'

অধ্যাপক সাহনি নোনা মাটির নমুনা নিয়ে যে পরীক্ষা চালালেন, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভবপর হল যে, অধ্যাপক Koken ও অধ্যাপক Noetling-এর অনুমান যথার্থই ছিল। এ সম্পর্কে তিনি লিখলেন : 'উপরের শিলাস্তরের তুলনায় নিচের লাবণিক স্তরের বয়স অনেক কম। এর মাত্র একটি কারণই দেখানো যেতে পারে এবং সেটি হচ্ছে এই যে, Palaeozoic শিলাস্তর এবং তারও পূর্ববর্তী Eocene যুগের তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত যেসকল শিলাস্তর একে অন্যের উপর স্থাপিত থেকেছিল, তারা ভূগর্ভ থেকে উৎক্ষেপিত কোন শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে অনেক মাইল চলে এসে লাবণিক পাহাড়ের চূড়ায় বসে গিয়েছে। খনিজ লবণ ও gypsum-এর পিচ্ছিল পদার্থের ওপর দিয়ে তারা একরকম বিনা আয়াসেই এই দীর্ঘ পর্যটন শেষ করেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।'

অধ্যাপক Halle-ও এই তত্ত্বগত মতবাদের নির্ভুলতা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, লাবণিক পাহাড়শ্রেণীর বৃহৎ অংশ যা দিয়ে গঠিত সেই পুরাজীবীয় (Palaeozoic) ও মধ্যজীবীয় (Mesozoic) স্তরগুলি এক প্রচণ্ড উৎক্ষেপের ফলে অন্যত্র থেকে এসে লবণস্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধ্যাপক Gee এবং অন্য কোন কোন ভূবিজ্ঞানী 'সাহনি-তত্ত্ব' মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা তাঁদের পূর্ব অভিমতই আঁকড়ে রইলেন, বললেন, 'ভূস্তরের স্বাভাবিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে, এখানেও তাই ঘটেছে। এবং সেজন্যই বয়সের বিচারে লাবণিক পাহাড়ের লাবণিক স্তরকে প্রাগ্-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের বলে মনে করতে হবে।' অধ্যাপক Gee-র যুক্তির বিরুদ্ধে অধ্যাপক সাহনি 1947 সালে বললেন, 'ক্যাম্ব্রিয়ান তত্ত্বের প্রবক্তা ভূবিজ্ঞানীরা ঘটনাস্থলে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের ওপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছেন, সেটা যে নির্ভরযোগ্য পন্থা নয়, তা' অনেকবার দেখানো হয়েছে। লবণ পাহাড়ের যে রহস্যটি এতদিন আমাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছে, সেটি এখন আর স্থানীয় সমস্যার পর্যায়ে নেই। অতএব ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে আজ তার বিচার হওয়া প্রয়োজন। শিলা যা' বলছে এবং ফসিল যা' বলছে, এই দুইয়ের মধ্যে সত্যিকার কোন বিরোধ থাকতে পারে না। যখন মনে হবে যে, উভয়ের ঐক্যমত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখন ফসিলের প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। ভূস্তর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উঠলে ঘটনাস্থলে গিয়ে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের চেয়ে ফসিল-বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করাই অধিকতর নিরাপদ।'

ভূতাত্ত্বিক কাল-নির্ঘণ্টের তৃতীয় পর্যায় নিয়ে আসামে কাজ

অধ্যাপক সাহনি বর্মা অয়েল কোম্পানীর পক্ষ হয়ে আসামে Tertiary (ভূতাত্ত্বিক কালের নিরিখে তৃতীয় পর্যায়) যুগ-পর্বের micro-fossil বা অণু-পরিমাণ ফসিল নিয়ে অনেক গবেষণা চালিয়ে এসেছেন। তাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আসামের অর্থনৈতিক ভূবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের ফলে সুনির্দিষ্ট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

জীবনের পরিণত বয়সে তিনি micro-palaeontology বা অণু-পরিমাণ ক্ষুদ্র ফসিল নিয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'গত কয়েক দশকে micro-palaeontology ভূবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, ভূস্তরে তেল খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে।' অপুষ্পল বৃক্ষোৎপাদী রেণু এবং পরাগ কণিকার ফসিল—যা' এখন Palynology নামে পরিচিত—নিয়ে গবেষণার প্রবর্তক ছিলেন ডঃ সাহনিই। ভারতীয় ভূস্তরবিন্যাসের নানা প্রশ্নের সমাধানে অপুষ্পল বৃক্ষোৎপাদী রেণুর ফসিলগুলি কাজে লাগানো যায় কিনা, প্রধানতঃ সে প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল। ভারতে যে তথাকথিত ফসিল-অনুৎপাদী শিলাস্তর রয়েছে, সেগুলির বয়স কেউ জানে না বা কেউ কেউ জানলেও তা' নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ডঃ সাহনি মাইক্রো-ফসিল সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলি পূর্বোক্ত স্তরগুলির ভৌগোলিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হল আসামের ভূতাত্ত্বিক যুগ পর্যায়ের তৃতীয় স্তরগুলি micro-fossil-এর দ্বারা অতিশয় সমৃদ্ধ। ভারতের বর্তমান উদ্ভিদকুলের পরাগ ও রেণুর নিদর্শনস্বরূপ একটি সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এ ধরনের একটি সংগ্রহশালা থাকলেই ফসিলে পরিণত অবস্থায় সে সকল পুষ্পরেণু ও পরাগ কি রূপ নিয়েছে, তার তুলনামূলক পরীক্ষা সম্ভবপর হত। ভারতে কয়লাখনির স্তরবিন্যাসের সংগে এসকল অপুষ্পল বৃক্ষোৎপাদী রেণু ও পরাগের ফসিলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য এ ব্যাপারে সুসম্বদ্ধ চর্চার পরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন। Palynological, অর্থাৎ অতি-ক্ষুদ্রায়তন রেণু ও পরাগের ব্যাপারে তিনি যে কতটা গুরুত্ব দিতেন, তা' বোঝা যায় এটা থেকেই যে, তিনি দেরাদুনের Oil and Natural Gas Commission ও লক্ষ্ণৌ-এর 'বীরবল সাহনি ইন্‌স্টিট্যুট অব প্যালিওবোটানি'তে Palynology, Coal-palaeobotany এবং Oil-micropalaeontology বিভাগ খোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

ভূবিজ্ঞানে সাহনির অবদান

বিজ্ঞানের যে শাখাটিতে 'ভূতাত্ত্বিক কাল-নির্ঘন্ট' (Geological Time Scale) পৃথিবী ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তা' বর্ণনা করতে গিয়ে 1893 সালে H. W. Williams Geochronology (ভূতাত্ত্বিক কালক্রম) শব্দটি তৈরি করেন। তিনি এবং আমেরিকার আর এক বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী Charles Schuchert বললেন, ব্যাপক অর্থে Geochronology বলতে বোঝাবে পলিমাটি ও জীবন ভিত্তি করে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ প্রসঙ্গটি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশিক প্রত্নবিদ্যার অধ্যাপক Frederick Zeuner বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেনঃ 'Williams এবং Schuchert উভয়ের সংজ্ঞাতেই ভূতাত্ত্বিক কাল-নির্ঘন্ট ও ভূস্তরবিন্যাসের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর পলিমাটির স্তরবিন্যাস উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের ওপর কম নির্ভরশীল নয়। এ ব্যাপারে বীরবল সাহনির কথাই ঠিক। কেননা, বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এবং ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে এ কথাটিই তিনি বলতে চেয়েছেন, "ভূতাত্ত্বিক কালক্রমের আরও পদ্ধতিগত উন্নয়ন চাইলে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানকেই তার অন্যতম বৃহৎ সহায়ক রূপে গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠবে"।

'ভূতাত্ত্বিক কালক্রম'-এর ব্যাপারে ফসিল-উদ্ভিদ কতটা সাহায্য করতে পারে সে সম্পর্কে ভারতীয় ভূবিজ্ঞানীরা সন্দিহান ছিলেন বলে ফসিল-উদ্ভিদ চর্চা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। এ অবস্থায় 1920 সালে অধ্যাপক Seward ও অধ্যাপক সাহনি ভারতীয় গণ্ডোয়ানা উদ্ভিদের তালিকা পুনরীক্ষণ সংক্রান্ত পুস্তকখণ্ড প্রকাশ করলেন। আজও এই পুস্তক ভারতীয় ভূবিজ্ঞান ও উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের পথ-নির্দেশিকা রূপে গণ্য হয়ে আসছে। অধ্যাপক Seward অধ্যাপক সাহনিকে যে কত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন, নিচের ঘটনা থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ঘটনাটি হচ্ছে এই ঃ একবার Geological Survey of India পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য কতকগুলি ফসিল সংগ্রহ করে অধ্যাপক Seward-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। Seward এই কাজের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে বলে পাঠালেন 'বীরবল সাহনিই এ কাজের উপযুক্ত লোক। এগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অগ্রাধিকার একমাত্র আমার ছাত্রটিরই (সাহনির) রয়েছে।'

অধ্যাপক সাহনির দেশে ফিরে আসার সংগে সংগেই ভারতে উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান চর্চার পুনরুজ্জীবন শুরু হল। একটি মানুষের মধ্যে ছিল দু'টি সত্তা, ভূবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী। অতএব, এই পুনরুজ্জীবন ঘটাবার উপযুক্ত লোক ছিলেন তিনিই। বিজ্ঞানী-জীবনের একেবারে গোড়ার দিকেই তিনি উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ভূবিজ্ঞানের বিরাট ভূমিকার কথাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ভূবিজ্ঞানীদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে, ফসিল-উদ্ভিদ চর্চার ফল হবে সুদূরপ্রসারী যা' ভূবিজ্ঞানীরা উপেক্ষা করতে পারবেন না।

ফল, ফুল বা মুকুল রক্ষায় সক্ষম শিলা পরীক্ষা করে দেখার জন্য উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানীদের যত কিছু কলাকৌশল কল্পনা করা যায়, অধ্যাপক সাহনি তার প্রত্যেকটিই প্রয়োজন মত প্রয়োগ করে দেখেছেন। যে সকল পলির স্তরে কিছুমাত্র প্রত্নসামগ্রী খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই বা যেগুলি সম্পর্কে প্রচণ্ড বিতর্ক রয়েছে, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তিনি সেগুলিও পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এজন্যও তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। তিনি কেবলমাত্র জানা পদ্ধতিগুলিরই উন্নতিসাধন করেননি, যে সকল পলি পরীক্ষা করে দেখার মতো বলে আগে কেউ মনে করতেন না, নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তিনি সেগুলিও পরীক্ষা করেছেন। ফসিল-ক্ষেত্রে গিয়ে কাজ করা তিনি পছন্দ করতেন এবং সেজন্যই তাঁর কার্যকলাপ কেবলমাত্র ল্যাবরেটারিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ফসিল-ক্ষেত্রে হাজির থাকার কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করতেন না। অসংখ্যবার তিনি খেওরার লবণ পাহাড়ে, বিহারের রাজমহল পাহাড়ে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে গিয়েছেন। খবরটি সকলেরই জানা। ফসিল-ক্ষেত্রে হাতে নোট বুক, উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞানীর হাতুড়ি ও ক্যামেরা নিয়ে তাঁর সুপরিচিত চেহারাটি অনেকেরই চেনা। কোন কিছু দেখে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করার তীক্ষ্ণ ক্ষমতা তাঁর যেমন ছিল, তেমনই ছিল জটিল ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। তিনি যে বিরাটাকার নোটগুলি রেখে গিয়েছেন, তার মধ্যেই এর প্রমাণ মিলবে। এ সকল টিকা ও মন্তব্যে ভারতের ফসিল-উদ্ভিদবিদ্যা, বিশেষ করে, লবণ পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

Geological Survey of India (ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা) তাদের কলকাতার সদর কার্যালয়ে ডঃ সাহনির একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন।

দশ

সাবিত্রী সাহনি

ডঃ সাহনির স্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী সাহনির কথা উল্লেখ না করলে এই সংক্ষিপ্ত জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পিতৃবন্ধু শ্রীসুন্দর দাস সুরীর কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রীকে তিনি বিয়ে করেন 1922 সালে। শ্রীসুরী সে সময় লাহোরে 'ইনস্পেকটর অব স্কুলস' ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি লাহোরের সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর নেন।

বীরবল সাহনি যেদিন সাবিত্রী সুরীকে বিয়ে করেন, প্রায় সেদিন থেকেই তিনি প্রত্যহ তাঁকে একটি করে ফুল উপহার দিয়ে এসেছেন। এটি দু'জনের কাছেই প্রায় একটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। বীরবল যেমন ফুল দেবার জন্য, তেমনই সাবিত্রীও ফুল উপহার পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। এক মুহূর্তের জন্যও সাবিত্রী ভাবেননি যে, একদিন এটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তারপর একদিন, কী যে ঘটতে চলেছে, তা বুঝে নেবার আগেই মৃত্যুর নির্মম হাত অধ্যাপক সাহনিকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তাঁর স্বপ্ন ভেঙে চূরমার হয়ে গেল। সাহনি চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন এবং সেই সংগে শ্রীমতী সাবিত্রীরও নিত্যদিনের প্রভাতী উপহার পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু শ্রীমতী সাহনি এখনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, প্রভাতী পুষ্প-উপহার ঠিকই আসছে। নিত্যদিন প্রভাতী পূজা-অর্চনার পর তিনি তাঁর স্বামীর ছবির সামনে ফুল রেখে দেন এবং সেই ফুল, মাত্র দু'টো ফুল তাঁর পায়ের কাছে গড়িয়ে চলে আসে। এটাকেই তিনি তাঁর স্বামীর দেওয়া উপহার মনে করে তুলে নেন।

অধ্যাপক সাহনি ও শ্রীমতী সাহনির এই নিবিড় সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সেটা এমনকি, সাহনির জীবনকালেই সকলের কাছে একটি পুরাকাহিনীর রূপ পেয়েছিল। সকলেরই মুখে মুখে একটি কথা ঘুরে বেড়াত—'কী অদ্ভুত দাম্পত্য-সম্পর্ক রয়েছে এই দু'জনের মধ্যে'। এর একটা কারণও ছিল। তাঁরা একে অন্যের প্রতি এমন অনুরক্ত ছিলেন যেমনটি খুব বেশী দেখা যায় না। চান্দ্র কার্তিক মাসের (অক্টোবর-নভেম্বর) কৃষ্ণা-চতুর্থীতে 'কার্বা চৌথ' উপলক্ষ্যে উত্তর ভারতের নারীরা স্বামীর দীর্ঘজীবন, সুখ, স্বাস্থ্য কামনা করে কঠোর উপবাসব্রত পালন করে থাকেন। শ্রীমতী সাহনিও এই উপবাস করতেন, এতে অবাক হবার কিছুই নেই। কিন্তু, অনেকের কাছে এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল—স্ত্রীর এই আবেগ-প্রবণতার বিনিময়ে অধ্যাপক সাহনিও সেই দিনটিতে অনশনব্রত পালন করতেন।

শ্রীমতী সাহনির কাছে তাঁর স্বামীর ব্যক্তিসত্তা লোপ পেয়ে প্রায় একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ পেয়েছিল এবং কেবলমাত্র তাঁর জন্য, তাঁর কর্মসাধনার জন্যই যেন তিনি বেঁচে ছিলেন। স্বামীর সম্পর্কে তাঁর এই উচ্চধারণার প্রতিদানে স্বামীও তাঁকে সমান মর্যাদা দিতেন এবং তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত বা ভবিষ্যতের করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে স্ত্রীর সংগে আলোচনা-পরামর্শ করতেন। প্রাক্-স্নাতক ছাত্রী হিসাবে সাবিত্রী কেবলমাত্র তাঁর 'লেকচার'গুলি

শুনেই কাজ শেষ করেননি, অধ্যাপককে নানা দিক থেকে বুঝে নেবার চেষ্টাও করেছেন। স্ত্রীর কাছে স্বামী যেন এক অদৃশ্য নিয়ামক শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। সেই বিশ্বাস এমনই প্রবল ছিল যে, অধ্যাপক সাহনির দৈনন্দিন কর্মসূচী দেখেই সাবিত্রী বুঝতে পারতেন বিকালে তাঁর মন-মেজাজ কেমন থাকবে এবং তদনুযায়ীই তিনি সেজে নিতেন। এমন একটি মুহূর্তও যায়নি অধ্যাপক সাহনি সাবিত্রীর কোন কাজে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বা মেজাজ হারিয়ে ফেলেছেন। সাবিত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা আঁচ করে নেবার বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল অধ্যাপকের। সাবিত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তা' যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, অধ্যাপক সাহনি সর্বদাই তা' মেনে নিতেন। নিচের ঘটনা থেকে তা' পরিষ্কার বোঝা যাবে।

লক্ষ্ণৌ-এ গোমতীর পাড়ে তাঁরা যে বাড়ি তৈরি করলেন, সেটির নকশা তাঁরা দু'জন একত্রে বসেই তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হলে দেখা গেল শ্রীমতী সাহনি তাঁর খুশীমতো 'প্ল্যান' বদলে দিচ্ছেন। তিনি চাইতেন এখানে একটি জানালা বসাও, ওখানে একটি দরজা দাও, ওপাশের জানালাটি রাখা চলবে না ... ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কোন কোন সময় পুরো একটি দেয়ালই উড়িয়ে দিতে বলতেন। অধ্যাপক সাহনির দিক থেকে আপত্তি ওঠার কোন প্রশ্নই ছিল না ; খরচের বহর যতই বেড়ে যাক না কেন, শ্রীমতীর আবদার মতো অদল-বদল করে নেওয়া হত। এই বাড়িটি ছিল তাঁদের উভয়ের গর্বের বস্তু এবং জীবনের শেষ বছরগুলি তাঁরা এখানেই কাটিয়েছেন। এ বাড়িটি থেকে খানিক দূরে গোমতীরই তীরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল এবং সেরকম একটি পরিকল্পনাও স্থির হয়ে গিয়েছিল যে, একখানা বজরা নির্মাণ করে দিনের শেষে সে বজরায় স্বামীকে তুলে নিয়ে আসার জন্য শ্রীমতী সাহনি গোমতীর জলে বজরা ভাসিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির হবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁদের এই ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল। ঠিক এমনই তাঁদের আর একটি ইচ্ছাও পূর্ণ হল না। অধ্যাপক চেয়েছিলেন কুমায়ুন পাহাড়ের আলমোড়ায় তাঁদের যে প্রাসাদোপম বাড়িটি ছিল সেটিকে Institute of Palaeobotany-র গ্রীষ্মকালীন আবাসিক সদর কার্যালয়ে পরিণত করবেন। ভারতীয় সমতল ভূমির অসহ্য গ্রীষ্মের দিনে গবেষণাগারটি আলমোড়ায় সরিয়ে নিলে সেখানকার পাহাড়ের শীতল পরিবেশে গবেষণার কাজ অপ্রতিহতভাবে চালানো যাবে বলেই তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু সেটা আর কোনদিনই হল না।

বীরবল সাহনি যখন কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে এসে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন তখন তাঁর মায়ের ইচ্ছা হল ছেলের বিয়ে দেবেন এবং এ ব্যাপারে সাহনির মতামত জানতে চাইলেন। জবাবে সাহনি বললেন, যাকেই তিনি বিয়ে করুন না কেন, তাকে অপূর্ব সুন্দরী হতে হবে এবং এই সুন্দরী খুঁজে আনার ভার তিনি মায়ের ওপরই ছেড়ে দিলেন। জীবনের সকল অভিব্যক্তিতে তাঁর সৌন্দর্যপ্রীতির কথা সকলেরই জানা ছিল। ভাবী পুত্রবধূ খুঁজে বের করতে মাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। শ্রীসুন্দর দাস সুরীর কন্যা সাবিত্রীকে তিনি তার শৈশবকাল থেকেই জানতেন। শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবী এই মেয়েটি সম্পর্কে ছেলেকে জানাতে বারাণসী ছুটে গেলেন। সে সময়কার রীতি অনুসারে বীরবল সাহনি মায়ের পছন্দের ওপর বিশ্বাস রেখে সাবিত্রী সুরীকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মায়ের ওপর বিশ্বাস রেখে তিনি নিরাশ হননি। এই শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলিতে বিমানে যাতায়াত এখনকার মতো ফ্যাশান হয়ে ওঠেনি এবং সেজন্যই সাহনি প্রয়োজনমতো সর্বদাই ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করতেন। কিন্তু সাবিত্রীর রূপে সাহনি তখন এমনই মুগ্ধ যে পাছে

কেউ তার সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে ফেলে, এই আশঙ্কায় তিনি কোন স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালেই কামরার পর্দা টেনে দিতেন।

তাঁর প্রতি এই সাদর মনোভাবের বিনিময়ে সাবিত্রীও সর্বদা স্বামীর মনস্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই চলতেন এবং কেবলমাত্র সেসকল কাজই করতেন যেগুলি স্বামীকে আনন্দ দিত। শেষ অসুস্থতার মাত্র একদিন আগের একটি ঘটনা। শ্রীমতী সাহনি একখানা হাল্‌কা নীল শাড়ি পরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। শাড়িখানা পুরোনো, কিন্তু সাহনি এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি সাবিত্রীকে এই প্রথম দেখলেন এবং বলে উঠলেন ঃ 'রঙটি চমৎকার মানিয়েছে তো।' শ্রীমতী সাহনির চটপট জবাব ঃ 'তাই যদি হবে, তবে এখন থেকে আমাকে কেবলমাত্র ঐ শাড়ি-পরা অবস্থাতেই দেখতে পাবে।' কিন্তু, নিয়তির বিধান ছিল অন্যরূপ। পরের দিন অধ্যাপক সাহনি এমন এক তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন যে তিনি আর সেরে উঠলেন না এবং শ্রীমতী সাহনিকে জীবনের বাকি দিনগুলি বিধবার শোক-পরিচ্ছদ পরেই কাটাতে হল।

শ্রীমতী সাহনির আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সাহচর্যই ছিল অধ্যাপকের সব কিছু। তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অর্জনের ব্যাপারে শ্রীমতী সাহনির আগ্রহ এবং তাঁর প্রতি সাবিত্রীর অবিচল নিষ্ঠা তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতেন। ভারতে এবং ভারতের বাইরে তাঁর বৈজ্ঞানিক পর্যটনে শ্রীমতী সাহনি ছিলেন নিত্যসংগী। তিনি জানতেন সংসারে মাত্র এই একটি মানুষের ওপরই তিনি নির্ভর করতে পারেন। সাবিত্রীর কাছে তিনি যে উৎসাহ, সমর্থন ও সাহায্য পেয়ে এসেছেন প্রায়শঃ সে কথাটি তিনি স্বীকারও করতেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে শ্রীমতী সাহনিকে তিনি বলে গেলেন ঃ 'ইন্‌স্টিট্যুটটি বড় করে তোলার কাজ রেখে গেলাম তোমার জন্য।' অধ্যাপক শ্রীমতী সাহনির ওপর যে কতটা আস্থা রাখতেন, এ উক্তিটিই আবার তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শ্রীমতী সাহনির কৃতিত্ব এই যে স্বামীর অসমাপ্ত কাজ তিনি অবিচলিত নিষ্ঠার সংগেই করে এসেছেন। পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে একথা বলতেই হয় আজ ইন্‌স্টিট্যুট যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সেটা অনেকাংশেই শ্রীমতী সাহনির বিরামহীন চেষ্টারই ফল। তিনি এই কাজে হাত না লাগালে শৈশবেই এই প্রতিষ্ঠানটির মৃত্যু ঘটত।

এগার

উপসংহারে

অধ্যাপক সাহনি বুঝতে পেরেছিলেন ফসিল-উদ্ভিদ-সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ নানা সংবাদ পরিবেশনের জন্য একখানা সাময়িকপত্রের প্রয়োজন রয়েছে এবং *Palaeobotanist* নামে একখানা সাময়িকপত্র প্রকাশের পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন। ভারতে এধরনের সাময়িকপত্র এই প্রথম বের হতে চলেছে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, 1952 সালে প্রকাশিত ঐ সাময়িকপত্রের প্রথম সংখ্যাটি 'বীরবল সাহনি স্মরণসংখ্যা'রূপেই প্রকাশিত হল। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিচালিত এই সাময়িকপত্রে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে পাঠানো গবেষণাপত্র ছাপা হয়।

বীরবল সাহনি ছিলেন দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে ভরপুর এক ব্যক্তিত্ব। কর্মতৎপর এই মানুষটি কখনও নিজেকে কাজ থেকে সরিয়ে রাখেননি। এমনকি, মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগেও তিনি বিজ্ঞানীদল সংগে নিয়ে রাজমহলের পাহাড় অঞ্চল ঘুরে এসেছেন। 'Institute of Palaeobotany'তে কি নিয়ে গবেষণা চলবে, তার একটি পরিকল্পনাও তাঁর মাথায় ছিল। ভারতের মৃত্তিকার কোন্ স্তরে কোন্ উদ্ভিদের অবশেষ রয়েছে, তার একটি পূর্ণ মানচিত্র আঁকাও তাঁর এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার একটি পরিকল্পনা হিমালয়ের স্পিটি অঞ্চলসহ ভারতের প্রত্যন্ত কোণে কোথায় কিসের ফসিল রয়েছে, সেগুলির খোঁজে বিজ্ঞানীদের নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়া। মৃত্যুর সময়েও তিনি স্পিটি থেকে খুঁজে-আনা Devonian যুগের উদ্ভিদ-ফসিল, পুরাজীবীয় (Palaeozoic) যুগের *Tubicaulis, Ankyropteris, Psaronius*-এর বৃক্ষ-ফার্ণ এবং দাক্ষিণাত্যের আন্তঃকৃষ্ণশিলাস্তরের *Cyclantdodendron Sahnii, Sausarospermum Fermori* প্রভৃতির ফসিল এবং *Nipadite* প্রজাতির উদ্ভিদ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করছিলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানের কল্যাণে তিনি যেসকল কাজ করে গিয়েছেন, অতি অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীই ততটা করেছেন। মাত্র ৫৭ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে ভারতের প্রায়ই প্রত্যেকটি বিদ্বজ্জন সভার সহিত যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর নিরলস কর্মতালিকায় এত কিছুর স্থান হয়েছে যে এমন আর একটি ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত তালিকাটি হচ্ছে এইরূপ।

লাহোরে পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে সেন্ট্রাল মডেল স্কুল এবং পরে গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে 1911 সালে বি. এস-সি ডিগ্রী নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার জন্য কেম্ব্রিজের 'ইমানুয়েল কলেজ'-এ ভর্তি হলেন। 1913 সালে Natural Sciences Tripos-এর Part I-এ প্রথম শ্রেণী পান। এরপরে ঐ একই কলেজে তিনি Foundation Scholarship-এর জন্য নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পরেই পেলেন Research Studentship. ইতিমধ্যে

একজন অনিসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর নাম নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, পৃথিবীর সর্বত্র তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য বিদ্বজ্জন সভা ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

1921 সালে তিনি লাহোর Philosophical Society-র প্রেসিডেন্ট হলেন, 1924 সালে Indian Botanical Society-র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। একাধিকবার এই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদও অলঙ্কৃত করেন। 1926 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। 1930 সালে কেম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত পঞ্চম International Botanical Congress-এর Palaeobotany বা উদ্ভিদাশ্মবিজ্ঞান শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন। সেযুগে একজন ভারতীয়ের পক্ষে এ সম্মান লাভ একটি অসাধারণ ঘটনা বলেই মনে করা হত।

1935 সালে তিনি আমস্টার্ডমে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ International Botanical Congress-এর Palaeobotany শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পরের বছর, 1936 সালের লন্ডনের 'রয়েল সোসাইটি' তাঁকে 'ফেলো' নির্বাচিত করে সম্মান জানালেন। ভারতীয়দের মধ্যে পঞ্চম এবং ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'রয়েল সোসাইটি'র ফেলো হন।

1932 সালে তিনি 'অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন', 'বোর্ড অব স্টাডিস', 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ড' ইত্যাদির সদস্য হন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'কাট্টামঞ্চি রামলিঙ্গ রেড্ডি জাতীয় পুরস্কার'ও তাঁকে দেওয়া হল। 1947 সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী স্মারক বক্তৃতা দেন। 1932 সালে তিনি লাহোরে Special University Lecturer-ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবার 1936 সালে লাহোর ও রোহতকে Extension Lecturer-ও হন। অধ্যাপক সাহনি দুইবার, 1921 ও 1938 সালে, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন—আবার এই শেষের বছরটিতে ছিল ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশনের রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবও। 1936 সালে সাহনিকে জীবন-বিজ্ঞান গবেষণার জন্য 'বার্কলে মেডেল' এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জন্য সি. আর. রেড্ডি 'ন্যাশনাল প্রাইজ' দেওয়া হয়। 1937 সালে তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভরাজ রায় 'রীডার' হন। 1938 সালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অধরচন্দ্র লেকচারার' হন; 1944-45 সালে বরোদায় গায়কোয়াড় লেকচারার'। 1937-38 সালে একবার এবং 1942-44 সালে দ্বিতীয়বার তিনি ভারতের 'ন্যাশনাল আকাদামি অব সায়েন্স'-এর প্রেসিডেন্ট হন। 1936 সালে তিনি ছিলেন ভারতের 'ন্যাশনাল ইন্‌স্টিট্যুট অব সায়েন্স'-এর বৈদেশিক শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 1940 সালে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশনের মাদ্রাজ অধিবেশনে জেনারেল প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক জনশক্তি কমিটি এবং বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটিরও তিনি সদস্য হয়েছিলেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আগে 1919-20 সালে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক এবং 1920-21 সালে লাহোরে ঐ একই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

1946 সালে অধ্যাপক সাহনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞান সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের বেসরকারী সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। 1947 সালে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'অনারারি' ডি. এস-সি ডিগ্রী পান।

রোহতকের খোকরা কট ঢিবিতে প্রাচীন মুদ্রার ছাঁচ আবিষ্কার এবং ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রা-

সংক্রান্ত গবেষণাপত্র 'প্রাচীন ভারতে মুদ্রা ঢালাইয়ের পদ্ধতি'-র জন্য 'নিউমিজম্যাটিক সোসাইটি' তাঁকে 'নেলসন রাইট' পদক উপহার দিলেন।

1947 সালে তিনি 'বোটানিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকা'র Foreign correspondent member ছিলেন; 1948 সালে 'আমেরিকান আকাদামি অব সায়েন্স'-এর Foreign Honorary Member। আবার সেবছরেই লণ্ডনে অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান কংগ্রেসে ভারত সরকারের প্রতিনিধি। 1950 সালে স্টকহোমে International Botanical Congress-এর জন্য Honorary President নির্বাচিত হলেন, কিন্তু এই পদের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ আর সম্ভবপর হল না। লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি Studies-এরও তিনি সম্পাদক ছিলেন (Faculty of Science and of Palaeobotany in India, a Bulletin of Current Research, Lucknow).

1947 সালে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অধ্যাপক সাহনিকে শিক্ষামন্ত্রকের সচিবের পদ নিতে অনুরোধ জানান। চিরদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মানুষটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ পদ গ্রহণে সম্মতি জানিয়ে 'তার' করলেন। কিন্তু, পরক্ষণেই এক তীব্র অনুশোচনা, 'এ তিনি কী করতে চলেছেন! নিতান্তই এক করণিকের চাকরি নেবার জন্য তিনি তাঁর প্রিয় গবেষণাগার ছেড়ে চলে যাবেন?' তখন মধ্যরাত্রি। এক তীব্র মানসিক জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি এক ঘন্টারও বেশী ঘরে পায়চারি করে অবশেষে শ্রীমতী সাহনিকে জাগিয়ে তুলে নতুন চাকরিটি নেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন। শ্রীমতী সাহনিও বললেন: 'ভারত সরকারের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে দাও।' অতএব, মাঝরাতেই আবার টেলিগ্রাফ অফিস। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বিতীয় তারবার্তা। প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে তিনি জানালেন, 'যেহেতু গবেষণার কাজেই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন এবং ইনস্টিট্যুট স্থাপনের কাজে নেমে পড়েছেন, অতএব অন্য কোন কাজে তাঁকে ডেকে নেওয়া মোটেই উচিত হবে না।' সংসারে এমন লোক খুবই বিরল যাঁরা এধরনের একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী অধ্যাপক সাহনি তাঁর সযত্নলব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার সকলের জন্যই উজাড় করে দিয়েছেন: চিন্তার ক্ষেত্রে সততা এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে সংস্কার-মুক্ত মন গ্রহণের প্রবণতা তাঁকে এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত করেছিল। তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত বা অভিমত যখনই সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠত, তখনই তিনি সেটা সংশোধন করে নিতে প্রস্তুত থাকতেন, মিথ্যা মর্যাদাবোধ কখনও অন্তরায় সৃষ্টি করত না। আর, বিষয়টি যদি বিতর্কমূলক হত, তবে তিনি দৃঢ়তার সংগেই তাঁর মতামত জানাতেন, যুক্তিহীন একগুঁয়েমি তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম গুণাবলীর মধ্যে ছিল রসবোধ, যা কাউকে বিদ্রূপ করতে, বা কাউকে হেয় জ্ঞান করতে জানত না। অন্যরা তাঁর সংগে একমত হবেন না জেনেও তিনি কোনরূপ বিদ্বেষ বা শ্লেষ প্রকাশ না করে তাঁর নিজের মতামতটি জানিয়ে দিতেন। এটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং এজন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাও পেয়ে এসেছেন।

লীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Suzanne Leclerc তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, 'অধ্যাপক সাহনির ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নম্র। তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, চরিত্রের গভীর মানবিক স্পর্শ অতি স্বাভাবিকভাবেই সহমর্মিতা জাগিয়ে তুলে স্বতঃস্ফূর্ত বান্ধবতায় নিয়ে পৌঁছোতো। একজন খাঁটি সম্ভ্রান্ত মানুষের চরিত্রে যা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে,

অর্থাৎ কর্তব্যবোধের সংগে সরলতা ও বিনয়-নম্রতা, তাঁর মধ্যে সেটা যথেষ্টই দেখা গিয়েছে।'

ডঃ সাহনি ছিলেন কঠোর আদর্শবাদী : বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞ মানুষটি, এমনকি, নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেও এক ধরনের প্রচ্ছন্ন কৌতুক বোধ করতেন।

সাদা খাদির চুড়িদার পায়জামা, সাদা শেরওয়ানি ও গান্ধী টুপি পরিহিত মানুষটি সব সময় পরিচ্ছন্ন ও ফিট্‌ফাট ; মানুষটির নিকট সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই তার সুরুচিপূর্ণ ভদ্র আচরণে মুগ্ধ হতেন। গভীর প্রজ্ঞার সংগে যুক্ত হয়েছিল এক অমায়িক ব্যক্তিত্ব, সেই সংগে ছিল কথা বলার অপূর্বভঙ্গী, চমৎকার বাগ্মিতা। চরিত্রে ছিল প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তি : শান্ত, সংযত, ভদ্র ও বিনয়ী।

ভারতে উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে বীরবল সাহনি স্বর্ণ পদক। ডঃ সাহনিরই ছাত্র মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় বোটানি ল্যাবরেটারির ডিরেক্টর 'প্লান্ট প্যাথলজিস্ট' অধ্যাপক টি. এস. সদাশিবন এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন। অধ্যাপক সাহনির মৃত্যুতে এক শোকবার্তায় তিনি বলেছেন : 'জাতির উচ্ছ্বাস-উল্লাসের অবসানের ঠিক পরে পরেই এক লব্ধ প্রজ্ঞা বিজ্ঞানী চলে গেলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভাবীকাল ডঃ সাহনিকে জার্মানীর Engler, Strasburgor, Goebel, Sachs ও de Bary, ফ্রান্সের Guillermond এবং ব্রিটেনের Scott, Seward ও Bower-এর সমপর্যায়ের আসন দেবে। কেননা, এসকল বিজ্ঞান-সাধকের মতোই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যুক্তিবাদী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেরণায় অভিষিক্ত। সত্যই অধ্যাপক সাহনি তাঁর "পদচিহ্ন" রেখে গিয়েছেন "সময়ের বালুচরে নয়" ; ভূবিজ্ঞানের কাল-নির্ঘন্টের অতি বিস্তীর্ণ পরিসরের সর্বত্র তাঁর পদচিহ্ন চিরকালের জন্য আঁকা রয়েছে।'

তাঁর জীবনকালে তিনি যে গবেষণা করে গিয়েছেন, তার পরিমাণ এত বেশী যে এই 'মনোগ্রাফ'-এ তার সব কিছু উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। একথা বললেই যথেষ্ট হবে ফসিল উদ্ভিদবিজ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে বীরবল সাহনি তাঁর সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে যাননি।

পরিশিষ্ট

বীরবল সাহনির গবেষণাপত্রের তালিকা

1915. Foreign pollen in the ovules of *Ginkgo* and its significance in the study of fossil plants. *New Phytol.* **14** (4 and 5), 149-151.

1915. The anatomy of *Nephrolepis volubilis* J. Sim with remarks on the biology and morphology of the genus. *New Phytol.* **14** (8 and 9), 251-274.

1916. The vascular anatomy of the tubers of *Nephrolepis*. *New Phytol.* **15** (3 and 4), 72-80.

1917. Observations on the evolution of branching in the Filicales. *New Phytol.* **16** (1 and 2), 1-23.

1918. On the branching of the Zygopterideau leaf and its relation to the probable 'pinna' nature of *Gyropteris sinuosa* Goeppert. *Ann. Bot.* **32** (127), 369-379.

1919. (With J. C. WILLIS) *Lawson's text book of botany.* London : Univ. Tut. Press.

1919. On an Australian specimen of *Clepsydropsis*. *Ann. Bot.* **33** (129), 81-92.

1920. Petrified plant remains from the Queensland Mesozoic and Tertiary formations. *Queensland Geol. Surv. Publ.* No. 267, pp. 1-48.

1920. On the structure and affinities of *Acmopyle Pancheri* Pilger. *Phil. Trans. B*, 210, 253-330.

1920. (With A. C. SEWARD) Indian Gondwana plants : a revision. *Mem. Geol. Surv. Ind. Pal. Ind.* 7(1), 1-40.

1920. On certain archaic features in the seed of *Taxus baccata*, with remarks on the antiquity of the Texinea. *Ann. Bot.* **34** (133), 117-133.

1921. On a new abnormality in the sporophyll of *Tmesipteris*. *Proc.* (*8th Ind. Sci. Cong. Cal.*) *Asiat. Soc. Beng.* (N.S.) **17** (4), 179.

1921. A stem impression from the plant-bearing beds near Khunmu (Kashmir), Provisionally referred to *Gangamopteris Kashmirensis* Seward. *Proc.* (*8th Ind. Sci. Cong. Cal.*) *Asiat. Soc. Beng.* (N.S.), **17** (4), 200.

1921. Note on the presence of a 'tent-pole' in the seed of *Cephalotaxus Pedunculata*. *Ann. Bot.* **35** (138), 297-298.

1921. The present position of Indian Palaeobotany. Pres. Add. *8th Ind. Sci. Cong. Cal. Proc. Asiat. Soc. Bengal* (N.S.), **17** (4), 152-175.

1923. On the theoretical significance of certain so-called 'abnormalities' in the sporongiophores of the Psilotaceae. *J. Ind. Bot. Soc.* **3** (7), 185-191.

1923. Modern Psilotaceae and archaic terrestrial plants. *Nature*, **3**, 84.

1923. On the structure of the cuticle of *Glossopteris angustifolia* Brongn. *Rec. Geol. Surv. Ind.* **54** (3), 277-280.

1924. On the anatomy of some petrified plants from the Government Museum, Madras. *Proc. 11th Ind. Sci. Cong. Bangalore*, p. 141.

1925. The antogeny of vascular plants and the theory of recapitulation. *J. Ind. Bot. Soc.* **4** (6), 202-216.

1925. (With E. J. BRADSHAW) A fossil tree in the Panchet Series of the Lower Gondwanas near Asansol. *Rec. Geol. Surv. Ind.* **58** (1), 77-79.

1925. On *Tmesipteris Vieillardi* Dangeard, an erect terrestrial species from New Caledonia. *Phil. Trans. B*, **213**, 143-170.

1926. The southern fossil floras—A study in plant geography of the past. (Pres. Add.) *13th Ind. Sci. Cong. Bombay*, pp. 229-254.

1926. (With T.C.N. SINGH) On some specimens of *Dadoxylon Arberi* Seward from New South Wales & Queensland. *J. Ind. Bot. Soc.* **5** (3), 103-112.

1927. (With A. K. MITRA) Notes on the anatomy of some New Zealand species of *Dacrydium*. *Ann. Bot.* **41** (161), 75-89.

1927. On some petrified cones of Indian fossil conifers from the British Museum, London. *Proc. 14th Ind. Sci. Cong. Lahore*, p. 215.

1927. A note on the floating island and vegetation of Khajiar, near Chamba, in the N-W Himalayas. *J. Ind Bot. Soc.* **6** (1), 1-7.

1928. Some petrified palms from the Central Museum, Nagpur. *Proc. 15th Ind. Sci. Cong. Calcutta*, p. 228.

1928. On a collection of petrified tree-trunks discovered in Eden Gardens, Calcutta. *Proc. 15th Ind. Sci. Cong. Calcutta*, p. 228.

1928. Dicotyledonous plant remains from the Tertiary beds of Assam. *Proc. 15th Ind. Sci. Cong. Calcutta*, p. 294.

1928. On *Clepsydropsis australis*, a Zygopterid tree-fern, with a *Tempskya*-like false stem, from the Carboniferous rocks of Australia. *Phil. Trans. B*, **217**, 1-37.

1928. Revisions of Indian fossil plants. Pt. I. Coniferales. (Impressions and incrustations) *Mem., Geol. Surv. Ind.* (N.S.), **11**, 1-49.

1930. The relation of the late Palaeozoic floras to the early Mesozoic floras. *Proc. 5th Int. Bot. Cong. Cambridge*. pp. 503-504.

1930. On *Asterochlaenopsis*, a new genus of Zygopterid tree-fern from Western Siberia. *Phil. Trans. B*, **218**, 447-471.

1931. On certain fossil epiphytic ferns found on the stems of the Palaeozoic tree-fern *Psaronius*. *Proc. 18th Ind. Sci. Cong. Nagpur*, p. 270.

1931. (With T.C.N. SINGH) Notes on the vegetative anatomy and female cones of *Fitzroya patagonica* (Hook Fils). *J. Ind. Bot. Soc.* **10** (1), 1-20.

1931. Materials for a monograph of Indian petrified palms. *Proc. Acad. Sci. U.P.* **1**, 140-144.

1931. Revisions of Indian fossil plants. Pt. II. Coniferales (b. petrifactions). *Mem. Geol. Surv. Ind. Pal. Ind.* (N.S.) **2**, 51-124.

1931. Miscellaneous notes. Supplementary note on revisions of Indian fossil plants. Pt. II. Coniferales (b. petrifactions). *Rec. Geol. Surv. Ind.* **65** (3), 441-442.

1932. *Palmoxylon Mathuri*, a new species of petrified palms from Cutch, Western India. *Proc. 18th Ind. Sci. Cong. Bangalore*, p. 322.

1932. Anatomical proof of the cycadophyte affinities of *Taeniopteris spatulata* McCl. *Proc. 18th Ind. Sci. Cong. Bangalore*, p. 322.

1932. On the Genera *Clepsydropsis* and *Cladoxylon* of Unger, and on a new genus *Austroclepsis*. *New Phytol.* **31** (4), 270-278.

1932. On the structure of *Zygopteris*, primacia (Cotta) and on the relations between the genera *Zygopteris*, *Etapteris* and *Botrychioxylon*. *Phil. Trans. B*, **222**, 29-45.

1932. *Homozylon rajmahalense* gen. et. sp. nov., a fossil angiospermous wood, devoid of vessels, from the Rajmahal Hills, Bihar. *Mem. Geol. Surv. Ind. Pal. Ind.* **20** (2), 1-19.

1932. A petrified *Williamsonia* (*W. Sewardiana*, sp. nov.) from the Rajmahal Hills, India. *Mem. Geol. Surv. Ind. Pal. Ind.* **20** (3), 1-19.

1932. On a Palaeozoic tree-fern, *Grammatopteris Baldaufi* (Beck) Hirmer, a link between the *Zygopterideae* and *Osmundaceae*. *Ann. Bot.* **46** (184), 863-877.

1932. Staminal movements in *Gerbera lanuginosa*. *J. Ind. Bot. Soc.* **11** (3), 241-242.

1933. The wood anatomy of a homoxylous dicotyledon, *Tetracentron sinese* Oliv. *Proc. 20th Ind. Sci. Cong. Patna*, p. 317.

1933. (With A. R. RAO) On some Jurassic plants from the Rajmahal Hills. *Asiat. Soc. Bengal* (N.S.), **27** (2), 183-208.

1933. *Dadoxylon Zalesskii*, a new species of Cordaitales trees from the Lower Gondwanas of India. *Rec. Geol. Surv. Ind.* **66** (4), 414-429.

1933. A fossil pentalocular fruit from Pondicherry, South India. *Rec. Geol. Surv. Ind.* **66** (4), 430-437.

1933. On some abnormal leaves of *Ginkgo*. *J. Ind. Bot. Soc.* **12** (1), 50-55.

1933. Explosive fruits in *Viscum japonicum* Thunb. *J. Ind. Bot. Soc.* **12** (2), 96-101.

1934. The silicified flora of the Deccan Intertrappean Series, Pt. I. General. *Proc. 21st Ind. Sci. Cong. Bombay*, 316-317.

1934. The silicified flora of the Deccan Intertrappean Series, Pt. II. Gymnospermous and Angiospermous fruit. *Proc. 21st Ind. Sci. Cong. Bombay*, pp. 317-318.

1934. (With B. P. SRIVASTAVA) The silicified flora of the Deccan Intertrappean Series. Pt. III. *Sausarospermum Fermori.* gen. et sp. nov. *Proc. 21st Ind. Sci. Cong. Bombay*, p. 318.

1934. Dr. S. K. Mukerji, F.L.S. (1896-1934). (Obituary) *J. Ind. Bot. Soc.* **13** (3), 245-249.

1934. (With A.R. RAO) *Rajmahalia paradoxa* gen. et. sp. nov. and other Jurassic plants from the Rajmahal Hill. *Proc. Ind. Acad. Sci.* **1** (6) 258-269.

1934. Dr. Dukinfied Henry Scott. (Obituary). *Curr. Sci.* **2** (10), 392-395.

1934. The Deccan Traps : Are they Cretaceous or Tertiary ? *Curr. Sci.* **3 (10)**, 392-395.

1935. The relations of the Indian Gondwana flora with those of Siberia and China. *Proc. 2nd Cong. of Carb. Stratig. Heerlen. Holland Compte Rendu* **1**, 517-518.

1935. The Glossopteris flora in India. *Proc. 6th Int. Bot. Cong. Amsterdam*, **2**, 245-248.

1935. *Homoxylon* and related woods and the origin of angiosperms. *Proc. 6th Int. Bot. Cong. Amsterdam*, **2**, 237-238.

1935. Recent discoveries in the Rajmahal flora. *Proc. 6th Int. Bot. Cong. Amsterdam* **2**, 248-249.

1935. (With A. R. RAO) Further observations on *Rajmahalia Paradoxa*. *Proc. Ind. Acad. Sci.* **1** (11), 710-713.

1935. The roots of *Psaronius*, intra-cortical or extra-cortical ? A discussion. *Curr. Sci.* **3** (2), 555-559.
1935. Permo-Carboniferous life provinces with special reference to India *Curr. Sci.* **4** (6), 385-390.
1936. Pollen grains in the stylar canal and in the ovary of an angiosperm. *Curr. Sci.* **4** (8), 587-588.
1936. Antiquities from the Khokra Kot mound at Rohtak in the Jamna Valley. *Curr. Sci.* **4** (11), 796-801.
1936. The Karewa or Kashmir. *Curr. Sci.* **5** (1), 10-16.
1936. A clay seal and sealing of the Sunga period from the Khokra Kot mound (Rohtak). *Curr. Sci.* **5** (2), 80-81.
1936. The Himalayan uplift since the advent of Man : Its cult historical significance. *Curr. Sci.* **5** (1), 10-16.
1936. A supposed Sanskrit seal from Rohtak : A correction. *Curr. Sci.* **5** (4), 206-215.
1936. Wegener's theory of continental drift in the light of Palaeobotanical evidence. *J. Ind. Bot. Soc.* **15** (5), 319-322.
1936. The Gondwana affinities of the Angara flora in the light of geological evidence, *Nature*, **138** (3495), 720-721.
1936. The occurrence of *Matonidium* and *Weichselia* in India. *Rec. Geol. Surv. Ind.* **71** (2), 152-165.
1937. Speculations on the climates of the Lower Gondwanas of India, *Proc. 17th Int. Geol. Cong. Moscow*, pp. 217-218.
1937. A Mesozoic coniferous wood (*Mesembrioxylon shanense* sp. nov.) from the southern Shan States of Burma. *Rec. Geol. Surv. Ind.* **71** (4), 380-388.
1937. (With W. GOTHAN) Fossil plants from the Po Series of Spiti (N-W Himalayas) *Rec. Geol. Surv. Ind.* **72** (2), 195-206.
1937. Remarks on the papers on the Gigantopteris flora by Halle and, Jongmans. Compte Rendu du duexieme Congress pour 1' avancementdes etudes de Stratigraphic Carbonifere Heerlen. 1935, pp. 517-518.
1937. An appreciation of the late Sir. J. C. Bose. *Sci. & Cult.* **31** (6), 346-347.
1937. Professor K. K. Mathur (Obituary). *Curr. Sci.* **5** (7), 365-366.
1937. Revolutions in the plant world. (Pres. Add.). *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* pp. 46-60.
1937. The age of the Deccan Trap. (General discussion.) *Proc. 24th Ind. Sci. Cong. Hyderabad*, pp. 464-468.
1937. Wegener's theory of continental drift with reference to India and adjacent countries. (General discussion.) *Proc. 24th Ind. Sci. Cong. Hyderabad*, pp. 502-506.
1938. (With K. P. RODE) Fossil plants from the Deccan intertrappean beds at Mohgaon Kalan, C.P., with a note on the geological position of the plant-bearing beds. *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **7** (3), 165-174.
1938. Recent advances in Indian Palaeobotany. (Pres. Add. Botany Section.) *Proc. 25th Ind. Sci. Cong. Jubil. Sess. Calcutta* (2), 133-176 ; and *Luck. Univ. Stud.* (2), 1-100.
1939. Discrepancies between the chronological testimony of fossil plants and animals. *Proc. 25th Ind. Sci. Cong. Calcutta*, (4)—Discussion, pp. 156-163 and 195-196.

1939. The relation of the Glossopteris flora with the Gondwana glaciation (Pres. Add. Biol. Sec.) *Proc. Ind. Acad. Sci.* **9** (1), *B*, 1-6.
1939. The eastward opening of the Himalayan geosyncline into the Pacific Ocean. *Proc. 6th Pacific Sci. Cong.* pp. 241-244.
1940. The Deccan Traps : An episode of the Tertiary era. (Gen. Pres. Add.) *27th Ind. Sci. Cong. Mad.* (2), pp. 1-21. *Prakrati*, **3** (1) 15-35. 1944 (Gujarati trans.) *Prabuddha Karnataka*, **22** (2), 5-19 (Kannada trans. by H.S. Rao).
1940. The Palaeobotanical correlation of coal seams in India. *Proc. Nat. Inst. Sci. Ind.* **6** (3), 581-582.
1941. Yaudheya coin moulds from Sunet near Ludhiana in the Sutlej Valley. *Curr. Sci.* **10** (3), 65-67.
1941. Permanent labels for microscope slides. *Curr. Sci.* **10** (11), 485-486.
1941. Indian silicified plants. 1. *Azolla intertrappea Sahni* and H.S. Rao. *Proc. Ind. Acad. Sci.* **14** (6), *B*, 489-499.
1942. 'A short history of the plant sciences' and 'The cytoplasm of the plant cell'. Reviews. *Curr. Sci.* **11** (9), 369-372.
1943. *Rodeitcs*, gen. nov. 'Palaeobotany in India'. IV. *J. Ind. Bot. Soc.* **22** (2-4), 179-184.
1943. A new species of petrified palm stems, *Palmoxylon sclerodermum* sp. nov. from the Deccan Intertrappean Series. *J. Ind. Bot. Soc.* **22** (2-4), 209-224.
1943. Indian silicified plants. 2. *Enigmocarpon Parijai*, a silicified fruit from the Deccan, with a review of the fossil history of the Lythraceae. *Proc. Ind. Acad. Sci.* **17** (3), *B*, 59-96.
1943. (With S. R. N. RAO) On *Chara Sausari* sp. nov., a *Chara* (sensu tricto) from the Intertrappean cherts at Sausar in the Deccan. *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **13** (3), 215-223.
1943. (With H. S. RAO) A silicified flora from the Intertrappean cherts round Sausar in the Deccan. *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **13** (1), 36-45.
1944. (With K. R. SURANGE) A silicified member of the Cyclanthaneae from the Tertiary of the Deccan, *Nature*, **134**, 114-115.
1944. (With B. S. TRIVEDI) The age of the Saline Series in the Punjab Salt Range, *Nature*, **153**, 54.
1944. Age of the Saline Series in the Salt Range, Punjab, *Nature*, **153**, 462.
1944. The age of the Punjab Salt in the light of recent evidence. (Pres. Add. to the Nat. Acad. of Sci. Ind.). *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **14** (1-2), 49-66.
1944. Silicified fruits and seeds from Takli, near Nagpur, C.P. (Hislop and Hunter collection). 'Palaeobotany in India'—V. *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **14** (1-2), 80-82.
1945. The technique of casting coins in ancient India. *Mem Numis. Soc. Ind.* (1), 1-68.
1945. (With B. S. TRIVEDI) Age of the Saline Series in the Salt Range of the Punjab, *Nature*, **155**, 76.
1945. Microfossils and problem of the Salt Range geology. (Pres. Add. to the Nat. Acad. of Sci.). *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **14** (6), i-xxxii.
1945. (With R. V. SITHOLEY) Some Mesozoic ferns from the Salt Range, Punjab. *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **15** (3), 61-73.
1945. Obituary Note on B. P. SRIVASTAVA. *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **15** (6), 185-187.

1946. The quest for the early traces of the *Glossopteris* flora. (Introduction to C. Virkki's paper, 'Spores from the Lower Gondwanas of India and Australia.' *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **15** (4-5), i-iv.
1946. A museum of evolution. *Curr. Sci.* **15** (4), 99-100.
1946. Permanent labels for museums in damp tropical climate. *J. Ind. Mus.* **1**, 107-108.
1947. Microfossils and the Salt Range thrust. (Opening Address at the 2nd Symposium on the Age of the Saline Series.) *Proc. Nat. Acad. Sci. Ind.* **16** (2-4), i-l.
1947. A silicified Cocos-like palm stem, *Palmoxylon (Cocos) Sundaram*, from the Deccan Intertrappean beds. *J. Ind. Bot. Soc.* Iyengar Commem. Vol. pp. 361-374.
1947. Palaeontology and the measurement of geological time. *Curr. Sci.* **16**, 203-206.
1947. Professor George Matthai. (Obituary). *Curr. Sci.* **16**, 279-280.
1947. Microplaeontology in geology. 'Review of Principles of Micropalaeontology' by M. F. Glaessner. *Nature*, **160**, 771.
1947. Some aspects of earth history as revealed by fossils. *Kashi Vidyapith Silver Jubilee Commem. Vol.* pp. 1-27.
1948. The prospects of palynology in India. *Svensk. Bot. Tidsko.* **42** (4), 474-477.
1948. The Pentoxyleae : A new group of Jurassic gymnosperms from the Rajmahal Hills of India. *Bot. Gaz.* **110** (1), 47-80.